eচ্ছেমতো

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

আগস্ট, ২০২১

পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

e-পত্রিকা

eচ্ছেমতো

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
আগস্ট, ২০২১

মুখ্য সম্পাদক: ড. সুকুমার চন্দ্র, অধ্যক্ষ, পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

সম্পাদক: শ্রীমতি অদ্বিতীয়া চৌধুরী, সহকারী অধ্যাপক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

সম্পাদকমন্ডলী: ড. জয়দেব বেরা , সহযোগী অধ্যাপক, বাণিজ্য বিভাগ, পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

ড. সর্বশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

ড. অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য, সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

শ্রীমতি সুজাতা মাইতি, স্টেট এডেড কলেজ টিচার, ইতিহাস বিভাগ, পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

ড. পীযূষ কান্তি ভট্টাচার্য, স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ, পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

প্রচ্ছদ অঙ্কন: শম্পা সিং, ষষ্ঠ সেমেস্টার (স্নাতক, সাম্মানিক), প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

অলংকরণ: শম্পা সিং, ষষ্ঠ সেমেস্টার (স্নাতক, সাম্মানিক), প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, পিংলা থানা মহাবিদ্যালয় এবং সায়ন্তন দিন্দা, ষষ্ঠ সেমেস্টার (স্নাতক, সাম্মানিক), প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

প্রকাশনা: পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়, মালিগ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১৪০

মুখ্য সম্পাদকের কলম

প্রকাশিত হতে চলেছে কলেজ ম্যাগাজিন eচ্ছেমতো। এটি দ্বিতীয় সংখ্যা। সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা।

একবিংশ শতাব্দীর বাসিন্দারা আমরা, যারা বিজ্ঞানের ছত্রছায়ায় বড় হচ্ছি, কলেজ ক্যান্টিনে রবীন্দ্র সুকান্ত বা নজরুল জীবনানন্দ ভাবি না, পরিবর্তে চাই মোবাইলের খুঁটিনাটি উদ্ধার করতে। যদিও নুতন মোড়কের নতুন ভাবনা আসলে পুরানো সবকিছুর-ই নতুন উপস্থাপন বা প্রতিস্থাপন। খাবার হোটেল আজ পরিচিত রেস্তোরাঁ বলে। এমনিতেই বিয়ে বাড়িতে খাবার পরিবেশন পাড়ার ছেলেরা করে ফেলত। এখন তো সেটা ক্যাটারিং। ছোটখাটো একটা ব্যবসা, টাকার বিনিময়ে কোনো কাজ করা, যাকে কন্ট্রাক্টরি বলা হত, তাকে আজ আমরা বলি ফ্রিল্যান্সার। ডিজিটাল যুগে আমরা যেন ডিজিটাল না হয়ে যাই। মানুষ তৈরি করছে রোবট। যারা নাকি মানুষের মতোই চলাফেরা করে। মানুষের মতই কাজ করতে পারে। তবে তাদেরকে চালাতে গিয়ে মানুষ যেন রোবটের মত না হয়ে যায়। মানুষ আর রোবটের মাঝের ব্যবধান যেন অটুট থাকে।

ছোটগল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, কাব্য, নাটক আমাদের মননশক্তি সুদৃঢ় করে। আমাদের চিন্তাশক্তিকে ডিজিটাল করতে দেয় না। আমাদের ম্যাগাজিন eচ্ছেমতো, মানুষের ভাল লাগার জিনিসগুলির মননশক্তির প্রকাশ। eচ্ছেমতো-এর e কিন্তু e মেইল, e পেমেন্ট, e শপিং বা e লার্নিং-এর e-এর মত নয়।

ড. সুকুমার চন্দ্র
অধ্যক্ষ
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

সম্পাদকের কলম

একটা লেখা থাক অন্ধকারের জন্য। যে অন্ধকারে আকাশ ঢাকলে বৃষ্টি নামে ঝমঝমিয়ে। যে অন্ধকারে সাগর ডুবলে দিক হারায় নাবিক। যে অন্ধকারে চোখ বুজলে আগুণ জ্বলে ওঠে চিতায়। অন্ধকার জানে হারিয়ে যাওয়ার গল্প। ফিরব বলেও ফেরা হয়নি যে ছেলেটির, মায়ের মুখের আদল মনে পড়লে মন কেমন করে তার। শহর জুড়ে সন্ধ্যে নামে। লোডশেডিং-এ আর ভয় পায় না সে। তার চোখে জল ঝরলে দূরের পাহাড়ে জোনাক জ্বলে। সে দেখতে পায়, সন্তানের জন্য ভাত বেড়ে দিচ্ছে কোনো এক মা। ঘুমেরা অন্ধকার ভালোবাসে। একটা লেখা থাক সেই অন্ধকারের জন্য। যে অন্ধকারে প্রিয়জনেরা তারা হয়ে জ্বলে ওঠে আকাশে।

একটা লেখা থাক অসুখের জন্য। যে অসুখে জলপট্টির সোহাগ জমে ওঠে জ্বরের সাথে। যে অসুখে শ্বাস-প্রশ্বাসেরা হিসেব কষে জমা-খরচের। যে অসুখ শিয়রে বসতে দেয় না প্রিয়তমাকে। অসুখ খুঁজে নেয় মানুষকে, নাকি মানুষ খুঁজে পায় অসুখকে, তা নিয়ে জোর তর্ক চলে চায়ের আড্ডায়। অসুখ কেবল নিয়তির কথা শোনে। হাসপাতালের বিছানা জানে অসুখ শুধু ওষুধে সারে না। একটা লেখা থাক সেই অসুখের জন্য। যে অসুখের শেষে দইওয়ালার সাথে ফের দেখা হয় অমলের।

একটা লেখা থাক মৃত্যুর জন্য। যে মৃত্যু তেল ফুরিয়ে আসা লণ্ঠনের শিখার মতো অনিশ্চিত। যে মৃত্যু মায়ের আঁচলের গন্ধের মতো সুন্দর। যে মৃত্যু গাড়ির চাকা থেকে ছিটকে আসা কাদার মতো দুঃসহ। যে মৃত্যু প্রেমিকের ব্যর্থতার মতো অবশ্যম্ভাবী। সব মৃত্যুর সার্টিফিকেট থাকে না। জন্মদিন যাদের মনে থাকে না, অবিচুয়ারি লিখতে ভোলে না তারাও। ফেসবুকে কমেন্ট কত জমলো, তা দিয়ে বোঝা যায় কোন মৃত্যু কতটা আকস্মিক। নিত্যযাত্রীর ভিড় থেকে দু-চারটে মুখ বাদ গেলে তেমন কিছু যায়-আসে না কারও। মৃত্যুর পরেও ছোটোগল্পের শেষ লাইনের মতো প্রশ্নচিহ্ন নিয়ে যে দাঁড়িয়ে থাকে, তার নাম সম্পর্ক। একটা লেখা থাক সেই মৃত্যুর জন্য। যে মৃত্যু শিখিয়ে দেয়, জ্বরা-ব্যাধি-মৃত্যুর আগের অংশটুকুর নাম জীবন।

আর বাকি সব লেখা থাক ইচ্ছেদের জন্য — মাস্কবিহীন, ইচ্ছেমতো।

শ্রীমতি অদ্বিতীয়া চৌধুরী

সহকারী অধ্যাপক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

বিশেষ কলম

মনে পড়ে

অধ্যাপক প্রবীর ঘোষ রায়
জয়েন্ট ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন্স
ডিপার্টমেন্ট অব হায়ার এডুকেশন
গভর্নমেন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল

মনে পড়ে যায় অনেক আলোর দিন
অনেক রঙের ভালোবাসা দিয়ে আঁকা,
মনে পড়ে যায় মেঘ-ভাঙা আশ্বিন
প্রতিমার মুখে মায়ের আদল মাখা।

মনে পড়ে যায় কাশবন পার হয়ে
নদীর চরায় গোপন নিমন্ত্রণ,
মনে পড়ে যায় সাদা-ডানা পাখিদের
সঙ্গে দুপুর নিবিড় আলিঙ্গন।

মনে পড়ে যায় আকাশের চিলেকোঠা
মেঘেদের কথা শুনছিল মন দিয়ে
মনে পড়ে যায় অবিকল রূপকথা
পরী নেমে আসে জাদুকাঠি হাতে নিয়ে।

মনে পড়ে যায় একা খুব নৌকোয়
খেয়া-পারাপার তারা-নেভা ভোরবেলা
অনেক পিছনে ফেলে আসা কৈশোর
মনে পড়ে যায় সেদিনের ধুলোখেলা।

বিশেষ কলম

দেশের মুক্তিতে প্রয়োজন দেশের শিক্ষার

ড. কৌশিক ঘোষ
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, খড়গপুর কলেজ
সদস্য, পরিচালন সমিতি, পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আমরা বড় হয়ে উঠি। কিন্তু ইতিহাসের ছাচে আমরা সবাই এক রকমভাবে তৈরী হই না। অথচ একদল সুযোগ সন্ধানী মানুষ সেই প্রেক্ষাপট নিজের মত ব্যবহার করে পরিবেশ নির্মাণ করতে চাইছেন। আর সেই বিষময় পরিবেশের উপাদানে প্রভাবিত হচ্ছে মানবের ধর্মচেতনা, শিক্ষাচিন্তা, উৎপাদন ও জীবিকা। ফল স্বরূপ বিঘ্নিত হচ্ছে সম্পূর্ণ বাস্তুতন্ত্র(Total Ecology)।

এই সমস্যার কথা রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই বুঝেছিলেন।পারিবারিক আনুষ্ঠানিক ধর্মচিন্তা থেকে সরে এসে মানুষের ধর্মে পৌঁছতে হবে - আত্মার মধ্যে পরমাত্মার অবস্থান, এ বোধ তিনি আমাদের মনে জাগাতে চেয়েছেন। আনুষ্ঠানিক মন্ত্রচর্চা থেকে মানবচর্চা-ই একমাত্র পারে বিশ্বমানববোধকে পৌঁছে দিতে গভীর স্থিতিশীলতায়। মন্ত্রহীণ ব্রাত্যতায় মন্দির, গির্জা, মসজিদের উপাসনার বাইের মনের মানুষের অবস্থান। তিনি মনের মানুষকে খুজে নিতে বলেছেন, 'মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ।' মনের মানুষের জ্যোর্তিময় জাগরণই পারে বিশ্বমনের (Universal Mind) উন্মোচন।

রবীন্দ্রনাথের এই মূল্যবোধ তাঁর নিজের দেশ, আমাদের ভারতবর্ষ অনেক আগেই নস্যাৎ করে দ্বিখন্ডিত হয়েছে। বর্তমানে আর তা-ই অনুসরণ করে খন্ডিত হচ্ছে বিশ্বের অন্য দেশ সকল। কিন্তু কবির মানব চর্চা নিছক তাত্ত্বিক চর্চা নয়। যতই আমরা জাতি সত্ত্বার কথা বলি, জাতীয়তাবাদের কথা বলি না কেন, সংহতি বাদ দিয়ে তা অসম্ভব, অবাস্তব। তিনি একথাও বলেছেন সংহতি মানে একাকার নয়। "একাকার হওয়া এক হওয়া নয়। ...সত্যকার স্বাতন্ত্র্যের উপর সত্যকার ঐক্যের প্রতিষ্ঠা।" নতুন যুগের নেতারা যতই স্বাতন্ত্র্যের সাধনায় মাতুন না কেন, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ঐক্যের সাধনার জন্যই স্বাতন্ত্র্যের সাধনা। নেতারা একমত হতে পারেন, না পারেন। তিনি আরও মনে করিয়ে দিয়েছেন, মুক্তি জাতি বিশেষ-এর নয়, নিখিল মানবের মুক্তি। এ মুক্তির ক্ষেত্রও তিনিই চিহ্নিত করে বলেছেন, গ্রামের সব স্তরের মানুষ যদি যৌথ জীবন গড়ে তোলার শিক্ষা পায় তবে জাত পাত, ধর্মগোষ্ঠীর বিরোধ মিটতে পারে। সেই সহযোগিতার মানসিকতা বৃহত্তর ক্ষেত্রে যে সাম্যবোধ তৈরী করবে তাকে সংকীর্ণমনা রাজনৈতিক নেতা বা হিংসাশ্রয়ী ধর্মগোষ্ঠী নষ্ট করতে পারবে না।

"মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পালাইবে ধেয়ে।"

তাঁর এই শিক্ষায় শিক্ষা- সাহিত্য-সংস্কৃতি একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তাঁর এই শিক্ষা চিন্তার যথার্থ অনুধাবন করলে বোঝা যায় তিনি স্পষ্টতই বলেছেন, যথার্থ শিক্ষা লাভ ছাড়া মানুষ যথার্থ সংস্কৃতির আলোক প্রাপ্ত হন না। 'কালান্তর'-এ 'বইয়ের সমাধান' প্রবন্ধে অকুণ্ঠ ভাষায় বলেছেন, "...দেশকে মুক্তি দিতে হলে দেশকে শিক্ষা দিতে হবে...।" আমাদের মনস্বী সভ্যতার হৃত গৌরব ফিরে পেতে এই শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। মানব সভ্যতার রক্ষার্থে শুধু আমাদের দেশই নয়, বিশ্বেরও তাঁকে আজ স্মরণ করার আশু প্রয়োজন।

বিশেষ কলম

৭৫ তম স্বাধীনতা

ড.নির্মল বর্মন, ডি.লিট
কবি, সাহিত্যিক এবং সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
দেশপ্রাণ মহাবিদ্যালয়

স্বাধীনতার ৭৫ তম বর্ষে কূটকচালি তে ঝাঁঝরা ভারতবর্ষ।
সংগ্রামীদের রক্তের ফোঁটা দিয়ে
চা বাগানে, কফি বাগানে
কয়লা খনিতে, পর্বতে জঙ্গলে
কপি পেষ্ট যে ভালবাসা
তার নাম স্বাধীন ভারতবর্ষ।
মানুষের হৃদয়ে রক্তাক্ত ভাবনা জমে আছে
মেসেনজার ডেমের কংক্রিট বাঁধের ছায়া
হলদিয়ার বুক চিরে উঠে আসা তেলে
ভাসছে মহান নেতার শরীর ।
শরীর থেকে দাঙ্গার রক্ত পরিষ্কার করে
ভারত কে সামনের সারিতে নিয়ে এসেছে
শোভাবাজারের সুতোকলের মজদুর।
রবীন্দ্র নৃত্যে কথাকলির ছন্দে
মহুয়ার রসে ভাঙড়ার দোলে
জেগে উঠবে মেহফিলের রাত।
ভাঙা চোরা হাত, হৃদয় শূন্য , উপড়ে আনা হিংসা
লবণাক্ত অশ্রু, রক্ত রস, ভালোবাসার ঘাম, বুকফাটা অভিমান আর হৃদয়ের নাম
স্বদেশ নিরন্ন বুভুক্ষু মানুষের স্বাধীন ভারতবর্ষ।

সূচীপত্র

"এবার কঠিন কঠোর গদ্যে হানো"

ব্লেন্ডেড লার্নিং পদ্ধতিতে পড়াশুনা : কয়েকটি কথা --- ড. জয়দেব বেরা --- ১১

কর্ম ও কর্মী - একটি অতিসংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন --- ড. সত্যনারায়ণ জানা --- ১৬

হৃদয় পেতে রই --- ড. সর্বশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় --- ১৯

সূ-যোগ -- ড. রাজর্ষি কয়াল --- ২৩

স্মৃতিপটে একটি নাম --- ড. গোপাল কৃষ্ণ গাঙ্গুলি --- ২৫

ন্যান্সী শোডোরো --- সুজাতা মাইতি --- ২৭

'জাদুকর' জর্জ মেলিস ও বিশ্বের প্রথম কল্পবিজ্ঞান চলচ্চিত্র 'আ ট্রিপ টু দ্য মুন' --- অর্পিতা সামন্ত --- ৩০

মহাকবি কালিদাসের সঙ্গে নাট্যকার ভবভূতির তুলনা --- রাজকুমার চক্রবর্তী --- ৩৬

করোনা বনাম রাজনীতি --- রামপদ সাউ --- ৪১

শেখর দেবরায়ের ভাষা আন্দোলনের নাটক --- ড. পীযূষ কান্তি ভট্টাচার্য --- ৪৯

অনুভূতি --- শ্রেয়সী কুন্ডু --- ৫৯

শিক্ষা ফিরুক ক্লাসরুমে --- শিল্পা করশর্মা --- ৬৪

কোভিড পরিস্থিতিতে অনলাইন শিক্ষা: এক শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গি --- অরিন্দম ভট্টাচার্য --- ৬৮

কর্তব্য --- সাগরিকা সাঁতরা --- ৭২

মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু হলো বই --- সুদীপ্তা মান্না --- ৭৮

সুখ --- অরিন্দম ভট্টাচার্য --- ৮১

Scientific Sensibility in time of Novel Corona Virus --- Subhasis Mandal --- ৯৭

আবেগী মন --- গোপাল বেরা --- ১০৩

লকডাউন ডায়েরি : Covid-19 এর সময়কালীন জীবনের একটি কাল্পনিক ঘটনা --- সুনন্দিতা মন্ডল --- ১০৬

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি প্রবেশ গ্রহণ যোগ্য নয় --- সৌভিক মান্না --- ১১১

স্বপ্ন ঘাতক করোনা --- প্রীতিলতা সামন্ত --- ১১৪

"এই অরণ্যে কবির জন্যে আমরা থাকি"

প্রহরী ---- শিবনাথ মুর্মু --- ২৬

কে তুমি --- প্রণব কুমার মাইতি --- ২৬

মনের আশা --- চয়ন কুমার মন্ডল --- ২৯
বৃত্তহীন --- রাজেশ জানা --- ৩৫
ভবঘুরে --- পুষ্পেন্দু মণ্ডল --- ৪০
করোনা'র প্রতি কবি --- শোভন ঘোষ --- ৪৩
কষ্ট --- শঙ্কর দাস --- ৫৭
খেলা হবে --- অনুশ্রী গুছাইত --- ৫৭
সাফেল্যর জন্য সংকল্প --- মির্জা মোজাম্মিল --- ৫৮
মেঘ বালিকা --- পায়েল প্রধান --- ৬৭
অভ্র জড়ানো মেঘ --- সুমন বেরা --- ৭১
জীবনযুদ্ধ --- সরস্বতী বেরা --- ৭৬
কথা দিলাম --- সেক নাসিম মহম্মদ --- ৭৭
আমাদের কথা --- সৌরাশিষ রাউৎ --- ৭৭
Destiny --- Debabrata Utthasini --- ৭৯
মধ্যবিত্ত --- মিতালী ভৌমিক --- ৮০
ছেলেবেলা --- অর্ঘ্য ভট্টাচার্য্য --- ৮০
আমার মা --- সেক নাসিম মহম্মদ --- ৮৪
শ্রাবণ --- সুমন্ত মিশ্র --- ৯৬
রক্তের বন্ধন --- সুস্মিতা সামন্ত --- ৯৬
রবীন্দ্রনাথের প্রতি --- শ্যামল প্রধান --- ১০২
আমাদের গাঁ --- প্রশান্ত দাস --- ১০২
আত্মশুদ্ধির পথে --- সুদেষ্ণা সামন্ত --- ১০৫
বেকার --- টুম্পা পাত্র --- ১১০
রঙিন জীবন --- প্রীতিলতা সামন্ত --- ১১০
মাসের মজা --- গোপাল দিন্দা --- ১১৩
করোনা ভাইরাস --- চন্দন মাজী --- ১১৬

কেমন আছো শিল্প?

পোড়া মাটির শিল্প --- গনেশ চন্দ্র পাল --- ৬২

বাড়ি --- সৌরভ দাস --- ৮৫

"এই এবড়ো-খেবড়ো রং"

শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে --- দুর্গা বেরা --- ১১৭
রঙ-রঙিন --- শম্পা সিং --- ১১৮
মধুবনী কনে --- সমাপ্তি পাত্র --- ১১৯
আজ জ্যোৎস্না রাতে --- সৌরভ দাস --- ১২০
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর --- অর্পণ কুমার দত্ত --- ১২১
মাধবীলতা --- মুনমুন সেনা --- ১২২

ফটো-সিন্থেসিস

লেন্স: সঞ্জয় প্রামানিক --- ১২৩-১২৬
লেন্স: শিল্পা করশর্মা --- ১২৬-১২৭
লেন্স: সমাপ্তি পাত্র --- ১২৮

ফেরা (২০২০-২০২১) --- ১২৯

ব্লেন্ডেড লার্নিং পদ্ধতিতে পড়াশুনা : কয়েকটি কথা

ড. জয়দেব বেরা
কো-অর্ডিনেটর, আই.কিউ.এ.সি. এবং সহযোগী অধ্যাপক, বাণিজ্য বিভাগ
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শুধু সুনাগরিক হিসেবে নয়, তাঁদেরকে "ভারচুয়াল সিটিজেন" হিসেবে গড়ে তোলবার স্বপ্ন নিয়ে শিক্ষা জগতে আবির্ভাব ব্লেন্ডেড লার্নিং-এর। ব্লেন্ডেড লার্নিং (Blended Learning সংক্ষেপে BL) নিয়ে ইদানিং শিক্ষাজগতে অনেক চর্চা চলছে। সহজ কথায় ব্লেন্ডেড লার্নিং পদ্ধতিতে পড়াশুনার মানে হল শিক্ষার মাধ্যম হবে মিশ্র, যার কিছুটা হবে শ্রেণীকক্ষে অর্থাৎ ক্লাসরুমে (যাকে আমরা অফ লাইন মোড বলি) আর কিছুটা হবে শ্রেণীকক্ষের বাইরে অর্থাৎ ক্লাসরুমের বাইরে (যাকে আমরা অন লাইন মোড বলি)। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (UGC) গত ২৯ শে মে ২০২১ তারিখে তাদের ৫৪৭-তম সভাতে ব্লেন্ডেড লার্নিং পদ্ধতিতে পড়াশুনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে এবং ঐ সভাতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, সমস্ত উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সিলেবাসের চল্লিশ শতাংশ (৪০%) অনলাইন মোডে এবং ষাট শতাংশ (৬০%) অফলাইন মোডে নিতে পারবে। অনেকে এর প্রশংসা করছেন আবার অনেকে এর সমালোচনা করছেন। আমরা এখানে আলোচনা করব ব্লেন্ডেড লার্নিং বিষয়টি কি, তার কাঠামো কিরুপ এবং আমাদের দেশে তার প্রয়োগের বাস্তবতা কতটা।

ব্লেন্ডেড লার্নিং-এর বৈশিষ্ট্য এবং কাঠামো:

ব্লেন্ডেড লার্নিং-এর মূল বৈশিষ্ট্য হিসাবে যা বলা হয়েছে- শেখার ক্ষেত্রে ছাত্রদেরকে বেশি পরিমানে নিয়োজিত করা, শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি, শেখানোর জন্য শিক্ষকদের দায়িত্ববোধ, সময় ব্যবস্থাপনা (Time Management, শেখানো এবং শেখার ক্ষেত্রে আরও নমনীয়তা, প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি, ধারাবাহিক শিক্ষায় জোর দেওয়া, পরীক্ষামূলক বিষয় শেখার ক্ষেত্রে ছাত্রদের সামনে অনেক সুযোগ ইত্যাদি। বলা হয়েছে ছাত্রদের অনেক সুবিধা হবে, যেমন- শেখার ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, তথ্য পাওয়ার দরজা খুলে যাবে এবং অন্যদের সংগে শেখা ও অন্যদেরকে শেখানোর সুযোগ সৃষ্টি হবে। ব্লেন্ডেড লার্নিং-এর কাঠামো হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে ফেস-টু-ফেস ক্লাস (face-to-face class), অন লাইন ক্লাস (on line class) এবং ফ্লিপড ক্লাসরুমের (flipped classroom) কথা। ফ্লিপড ক্লাসরুম হল প্রথাগত ক্লাসরুমের বিপরীত। প্রথাগত ক্লাসরুমে যেমন শিক্ষক ছাত্রদেরকে পড়ান এবং বাড়িতে হোমওয়ার্ক দেন, ফ্লিপড ক্লাসরুমে সেভাবে নয়। ফ্লিপড ক্লাসে ছাত্ররা অনলাইনে short lecture video দেখবে এবং তারপর ক্লাসরুমে আসবে গ্রুপ ওয়ার্ক, প্রজেক্ট ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করতে।

মূল্যায়ন রূপরেখা:

মূল্যায়ন নিয়ে অনেক ভারী ভারী কথা বলা হয়েছে। এখানে চারটি পদ্ধতির

কথা বলা হয়েছে।

(ক) Open book examination: প্রথাগত পরীক্ষার বাইরে খোলা বই নিয়ে পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে। ছাত্ররা যাতে বাস্তব জীবনের সংগে তাল মেলাতে পারে তার জন্য এই পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে।

(খ) Group examinations even for conventional theory papers: প্রজেক্ট এবং ল্যাবোরেটরী মূল্যায়নের ক্ষেত্রে Group examination-এর পদ্ধতি অনুসরণ করা হলেও থিওরি পেপারে এটা করা হয় না। বলা হয়েছে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করলে ক্লাসের গড় ফলাফল-এর উন্নতি হবে। ছাত্ররা উৎসাহিত হবে তাদের জ্ঞান শেয়ার করতে।

(গ) Spoken/Speaking examinations: সমস্ত ধরনের ছাত্রদের কাছে সহজে এবং দ্রুত পরীক্ষা নেওয়ার জন্য এই পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে।

(ঘ) On demand examinations: বর্তমানে যে ভাবে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা সূচী অনুযায়ী একসঙগে পরীক্ষা নেওয়া হয় তার পরিবর্তে ছাত্র-ছাত্রীদের দাবীমত সময়ে পরীক্ষা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

আমাদের দেশের সরকার ধরেই নিয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে মোবাইল ফোন বা অন্যান্য ইলেকট্রনিক গেজেট রয়েছে, বিদ্যুৎ সরবরাহের মান ভালো এবং ইন্টারনেট সংযোগ পর্যাপ্ত। প্রকৃত বাস্তব চিত্র কিন্তু তা নয়।

আমাদের দেশের বাস্তবতা:

ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর দিক থেকে সারা বিশ্বে ভারত দ্বিতীয় এটা ঠিক। এই তথ্যকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের দেশের সমস্ত উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্লেন্ডেড লার্নিং পদ্ধতি আনতে চাইছে। আর ভুলিয়ে দিতে চাইছে আসল তথ্য।

আমাদের দেশে জনসংখ্যার কত শতাংশ ইন্টারনেট ব্যবহার করছে, আর যে সমস্ত দেশকে আমাদের দেশের সরকার অনুকরণ করতে চাইছে সেই সমস্ত দেশে জনসংখ্যার কত শতাংশ ইন্টারনেট ব্যবহার করছে তার দিকে তাকালে বোঝা যাবে আসল চিত্র। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যায় বিশ্বের প্রথম দশটি দেশের জনসংখ্যা এবং কত শতাংশ জনসংখ্যা ইন্টারনেট ব্যবহার করছে তার তুলনা করলেই বোঝা যাবে আমাদের দেশের অবস্থান ঠিক কোথায়।

ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা এবং জনসংখ্যা অনুপাতে তার শতাংশ

দেশ	ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা (মিলিয়ন)	জনসংখ্যা,২০২১	জনসংখ্যা অনুপাতে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর শতাংশ
চীন	৭৬৫	১৪৪,৪২,১৬,১০৭	৫২.৯৬
ভারত	৩৯১	১৩৯,৩৪,০৯,০৩৮	২৮.০৬
মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্র	২৪৫	৩৩,২৯,১৫,০৭৩	৭৩.৫৯
ব্রাজিল	১২৬	২১,৩৯,৯৩,৪৩৭	৫৮.৮৮
জাপান	১১৬	১২,৬০,৫০,৮০৪	৯২.০২
রাশিয়া	১০৯	১৪,৫৯,১২,০২৫	৭৪.৭০
মেক্সিকো	৭৫.৯৪	১৩,০২,৬২,২১৬	৫৮.৩০
জার্মানি	৭৩.৪৩	৮,৩৯,০০,৪৭৩	৮৭.৫২
ইন্দোনেশিয়া	৬৬.৪৫	২৭,৬৩,৬১,৭৮৩	২৪.০১
ব্রিটেন	৬২.৩৫	৬,৮২,০৭,১১৬	৯১.৪১

সূত্র: www.worldpopulationreview.com

আমাদের দেশে জনসংখ্যার মাত্র ২৮.০৬ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করছে এবং বেশিরভাগটাই হচ্ছে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে। ব্লেন্ডেড লার্নিং পদ্ধতি চালু হলে বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রীকেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া হবে।

বাড়বে ডিজিটাল ডিভাইড:

ডিজিটাল এডুকেশানের জন্য বিদ্যুৎ একটি প্রয়োজনীয় জিনিস। Saubhagya Scheme যেখানে উজ্জ্বল ছবি দেখাচ্ছে ভারতে ৯৯.৯ শতাংশ বাড়িতে রয়েছে বিদ্যুৎ সংযোগ, সেই ছবি অনুজ্জ্বল দেখাবে যদি আমরা তাকাই বিদ্যুৎের মান এবং দিনে কত ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকছে তার দিকে। ভারত সরকারের গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকের (Ministry of Rural Development) ২০১৯ সালের সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে ১৬ শতাংশ বাড়িতে বিদ্যুৎ থাকছে ১ থেকে ৮ ঘন্টা, ৩৩ শতাংশ বাড়িতে বিদ্যুৎ থাকছে ৯ থেকে ১২ ঘন্টা, এবং মাত্র ৪৭ শতাংশ বাড়িতে বিদ্যুৎ থাকছে ১২ ঘন্টার বেশী। অন লাইন ক্লাসের জন্য প্রয়োজন কম্পিউটার অথবা স্মার্টফোন, সংগে ইন্টারনেট সংযোগ। আমাদের দেশে মাত্র ২৪ শতাংশ মানুষের রয়েছে স্মার্টফোন, আর মাত্র ১১ শতাংশ বাড়িতে রয়েছে যে কোনো ধরনের কম্পিউটার যার মধ্যে রয়ছে ডেস্কটপ কম্পিউটার, ল্যাপটপ, নোটবুক, নেটবুক, পামটপ এবং ট্যাবলেট। ২০১৭-১৮ সালের National Sample Survey Report on Education অনুসারে কেবলমাত্র ২৪ শতাংশ বাড়িতে রয়েছে ইন্টারনেটের সুবিধা। এই সুবিধা আবার সব জায়গায় সমান নয়।

গ্রামীণ ভারতে যেখানে ৬৭ শতাংশ মানুষ বাস করেন, সেখানে মাত্র ১৫ শতাংশ বাড়িতে রয়েছে ইন্টারনেটের সুবিধা। আবার শহরে ৪২শতাংশ বাড়িতে রয়েছে ইন্টারনেটের সুবিধা। রাজ্যগুলিতেও এই ব্যবধান প্রকট। কেরালাতে ২৩.৫ শতাংশ বাড়িতে রয়েছে ইন্টারনেটের সুবিধা, দিল্লীতে ৩৫ শতাংশ বাড়িতে রয়েছে ইন্টারনেটের সুবিধা, আবার বিহারে মাত্র ৪.৬ শতাংশ বাড়িতে রয়েছে ইন্টারনেটের সুবিধা। ব্লেন্ডেড লার্নিং পদ্ধতি চালু হলে এই ডিজিটাল ডিভাইড আরও বাড়বে।

বাড়বে জেন্ডার গ্যাপ:

শুধু ইন্টারনেট সংযোগের সমস্যা নয়, সেই সংযোগের সুবিধা কারা পাচ্ছে সেটাও বড় কথা। Internet and Mobile Association of India-এর ২০১৯ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করছে তার ৬৭ শতাংশ পুরুষ আর ৩৩ শতাংশ মহিলা। এই বৈষম্য আরও প্রকট গ্রামীণ ভারতে যেখানে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর ৭২ শতাংশ শতাংশ পুরুষ আর ২৮ শতাংশ মহিলা। সরকার যদি ব্লেন্ডেড লার্নিং পদ্ধতি অনুসরণ করতে বাধ্য করে তাহলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষাগত অসাম্য আরও বাড়বে, স্কুল-কলেজ ছুট ছাত্রীর সংখ্যা বাড়বে। আর "বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও" স্লোগান মুখেই থেকে যাবে, বাস্তবে প্রতিফলিত হবে না।

কমবে শিক্ষক পদ, বাড়বে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা:

ব্লেন্ডেড লার্নিং পদ্ধতি চালু হলে অর্থাৎ অন লাইন ক্লাসের সংখ্যা বাড়লে আগামীদিনে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বহু শিক্ষক পদ তুলে দেওয়া হবে। বহু বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ছাঁটাই হবে। শিক্ষক পদের সংখ্যা কমলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়বে। রিফ্রেশার বা ওরিয়েন্টেশন কোর্সে যেখানে চল্লিশ জন অংশগ্রহণ করতেন, এখন আট শত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে চলছে অন লাইন রিফ্রেশার বা ওরিয়েন্টেশন কোর্স। একদিকে যেমন শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়বে তেমনি শিক্ষা ব্যবসায়ীদের মুনাফার পরিমানও বাড়বে। চাকরী না পাওয়া শিক্ষিত বেকাররা নতুন নোমেনক্লেচার "ভারচুয়াল সিটিজেন" নিয়ে দেশের “গৌরব” বৃদ্ধি করবে।

কমবে মানব উন্নয়ন সূচক:

ব্লেন্ডেড লার্নিং পদ্ধতি চালু হলে জেন্ডার গ্যাপ এবং ডিজিটাল ডিভাইড বৃদ্ধি পাবে। জেন্ডার গ্যাপ বাড়লে এবং ডিজিটাল ডিভাইড বৃদ্ধি পেলে সামগ্রীকভাবে জ্ঞান অর্জন কম হবে। জ্ঞান অর্জন কম হলে মানব উন্নয়ন সূচক হ্রাস পাবে। কারণ মানব উন্নয়নের তিনটি মূল বিষয়- দীর্ঘ এবং স্বাস্থকর জীবন (a long and healthy life), জ্ঞান (knowledge), এবং যথোচিত জীবনযাত্রার মান (a decent standard of living) অর্জনের গড়কে নিয়ে তৈরি হয় মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index বা HDI)।

ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যায় বিশ্বের প্রথম দশটি দেশের মানব উন্নয়ন সূচক

দেশ	মানব উন্নয়ন সূচক	মানব উন্নয়ন র‍্যাঙ্কিং
চীন	০.৭৬১	৮৫
ভারত	০.৬৪৫	১৩১
মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্র	০.৯২৬	১৭
ব্রাজিল	০.৭৬৫	৮৪
জাপান	০.৯১৯	১৯
রাশিয়া	০.৮২৪	৫২
মেক্সিকো	০.৭৭৯	৭৪
জার্মানি	০.৯৪৭	৬
ইন্দোনেশিয়া	০.৭১৮	১০৭
ব্রিটেন	০.৯৩২	১৩

সূত্র: Human Development Report, 2020

মানব উন্নয়ন সূচকে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যথাক্রমে নরওয়ে (০.৯৫৭), আয়ারল্যান্ড (০.৯৫৫) এবং সুইজারল্যান্ড (০.৯৫৫)-এর কথা বাদ দিলাম। বাকী দেশগুলিও মানব উন্নয়ন সূচকে আমাদের দেশের তুলনায় অনেক এগিয়ে। আমাদের দেশের অবস্থান ১৩১তম। ব্লেন্ডেড লার্নিং পদ্ধতি চালু হলে অনেক ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। যারা ব্লেন্ডেড মোডে ক্লাস করবে তাঁদেরও ক্লাসরুমের তুলনায় জ্ঞান অর্জন কম হবে। আর সামগ্রীকভাবে জ্ঞান অর্জন কম হলে মানব উন্নয়ন সূচক আরও হ্রাস পাবে। তাতে বিশ্বের সামনে আমাদের দেশের সুনাম বৃদ্ধি পাবে কি? নীতিনির্ধারণকারীরা একটু ভেবে দেখবেন।

শিক্ষা যুগ্ম তালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় শিক্ষা নীতির রুপায়নের বিষয়ে রাজ্যগুলির সংগে কোনো আলোচনা না করে কেন্দ্রীয় সরকার তার সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। সংস্কার অবশ্যই প্রয়োজন। একটি প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা অনন্ত কাল ধরে চলতে পারেনা। তবে তার সংস্কারের জন্য চাই উপযুক্ত পরিকাঠামো, আর চাই সুপরিকল্পিত যুক্তিনির্ভর প্রস্তাবের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন। আর তা যদি না হয় তার ফল ভুগতে হবে সমগ্র সমাজকে। গুগল আর জুম কখনও ক্লাসরুমের বিকল্প হতে পারে না।

কর্ম ও কর্মী - একটি অতিসংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

ড. সত্যনারায়ণ জানা
সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

'কর্ম' কথাটির সহজ অর্থ হলো, যা করা হয় অর্থাৎ কার্য, যে-কোনো কাজ করাকে বুঝায়। আবার ঐচ্ছিক ক্রিয়া, অনৈচ্ছিক ক্রিয়া- শ্বাস-প্রশ্বাস, ওঠা,বসা, শোয়া, ঘুমানো, নিজের কাজ করা, অন্যের কাজ করে দেওয়া- সবই কর্মের মধ্যে বলে আমরা জানি। কাজেই আমরা 'কর্ম'- কি তা জানি, বুঝি এবং কর্ম করি। অর্থাৎ যে কর্ম করে সে কর্মী। আমরা মানুষ, তাই আমাদের ক্রিয়া-কর্মই নৈতিক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়, পশুপাখিদের ক্রিয়া-কর্ম নৈতিকতার অন্তর্ভুক্ত হয় না। অর্থাৎ মানুষের ক্রিয়া-কর্মেরই নৈতিক বিচার হয়। কর্ম করা বা না করার স্বাধীনতা থাকার জন্য ওই কাজের দায়ভার আমাদের গ্রহণ করতে হয়। আর যে কাজ এর দায়-দায়িত্ব আমাদের নিতে হয়, কেবল ওই সব কাজেই ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত প্রভৃতি নৈতিক গুণাগুণ প্রয়োগ করতে পারি। যেমন, 'সদা সত্য কথা বলিবে'- অর্থাৎ সত্য কথা বলা ভালো, 'না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়, চুরি করা বড় দোষ'- অর্থাৎ চুরি করা উচিত কর্ম নয় ইত্যাদি। সত্যকথা বলা বা চুরি করা আমাদের কাছে বাধ্যতামূলক নয়- অর্থাৎ আমরা যেমন সত্য কথা বলতে পারি, তেমনি মিথ্যে কথা বলতে পারি। আবার অন্যের সম্পদ চুরি করতে পারি, নাও চুরি করতে পারি। এক্ষেত্রে আমরা স্বাধীনভাবে কর্ম করতে পারি। স্বাধীনতা থাকায় আমরা স্বার্থ যুক্ত কর্ম করি, আবার নিঃস্বার্থ কর্ম ও করি। কর্ম আমাদের সর্বদাই হয়, সে ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক যাই হোক। কর্ম না করলে আমাদের শরীর যাত্রাও নির্বাহ হয় না। ফলে দেহাভ্যন্তরে ক্রিয়া সম্পর্কে- শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া, পরিপাক ক্রিয়া, যকৃত প্রভৃতি গ্রন্থির ক্রিয়া, প্রতিবর্ত ক্রিয়া, ইত্যাদি অনৈচ্ছিক ক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের কিছু করার নেই। কেননা, এখানে ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন নেই। এগুলি অনৈচ্ছিক ক্রিয়া বা কাজ। এগুলি অনৈতিক কর্মও বটে। অন্যদিকে, মানুষের ঐচ্ছিক ক্রিয়া বা স্বেচ্ছাকৃত কর্ম হল নৈতিক কর্ম। কেননা, অভাববোধ, লক্ষ্য, কামনা, বিবেচনা প্রভৃতি কর্মের সঙ্গে উচিত-অনুচিত, ভালো-মন্দ জড়িত। তার মানে আমরা স্বাধীন ভাবে আমাদের ঐচ্ছিক কর্ম তথা নৈতিক কর্ম করতে পারি এবং করিও। আমরা বলি, 'আমি' এই কর্ম করলাম, 'আমি' ওই কর্ম করলাম, 'আমি' ওকে এটি পাইয়ে দিলাম, 'আমি' আজ গাড়ি করলাম, 'আমি' এবছর একতলা বাড়ি, পরের বছর দোতলা বাড়ি করলাম - এ কাজের পর ওই কাজ, তারপর সেই কাজ- শুধু কাজ আর কাজ - রাতে ছ-ঘন্টা ঘুমটা ছাড়া শুধু কাজ, কাজের ঠেলায় চার-পাঁচ ঘণ্টা ঘুমের পরে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে - ওর এই কাজ, তার সেই কাজ – 'আমি' কাজ করতে খুব দক্ষ – ভালোবাসি, তাই করছি। অনেকজনকে বলতে শুনেছি – 'তুমি কি কাজ করো', 'আমি কত কাজ করি জানো'- বাঃ প্রকৃত কর্মীই বটে । প্রশ্ন: আচ্ছা, এত কাজ করো কেন? উত্তর, আরে আমি অন্যের কাজ করতে ভালবাসি – যে-কোনো কাজেই সুনিপুণ দক্ষ - কোনো সমস্যাই 'আমি' সমস্যা মনে করিনা। বাঃ একেবারেই নির্ভেজাল কর্মীই বটে। এ হল কর্মীর কর্মের নমুনা।

উপরিউক্তভাবে কর্ম ও কর্মীর সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু কথা জানলাম। আমরা প্রকৃত কর্মীর কথায় আপ্লুত, অভিভূত। এমন প্রচুর কর্মী আমাদের প্রতিদিনের জীবনে চোখে

পড়ছে। ভালো কথা অত্যন্ত ভালো দিক। আঃ খোঁচা মারছো কেন? আচ্ছা সব কর্ম ত্যাগ করলাম। এ গেল আমাদের কর্মের বাহ্যিক দিক। এই কর্মের একটি অভ্যন্তরের দিকও (বা তাত্ত্বিক দিক) আছে। সেটির দিকে দৃষ্টি দিতে পারি। কর্মে স্বাধীনতা আমাদের আছে - এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা কর্ম আদৌ বাহ্যিকভাবে নাও করতে পারি। অর্থাৎ কর্মত্যাগ করতে পারি। হ্যাঁ, এটি আমরা পারি। তা না হয় হলো। কিন্তু বাহ্যশরীরের কর্ম করা না গেলেও, বাহ্যকর্ম ত্যাগ করলেও মানসিক চিন্তনক্রিয়া বা প্রবহমান মনের কর্ম বন্ধ করব কি করে। তার মানে, মনের কর্ম বা কাজ বন্ধ করতে পারছি না আমরা। মন যে অনবরত কর্ম করে, সেই কর্মগুলি ও কর্ম। অনিবার্যভাবে প্রশ্ন এসে যায়, তাহলে কর্ম করে কে? উত্তর হলো, প্রকৃতির তিনগুণ। প্রশ্নঃ প্রকৃতি কি? উত্তর, আমাদের মধ্যে বা মনুষ্য প্রকৃতির মধ্যে ভালো-মন্দ এবং আলস্য - এই তিনটিগুণ যাদের নাম হল সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ - এই তিনটি গুণের সমন্বয়ে গঠিত প্রকৃতি। একটু বিস্তৃত করি। এই গুণসঙ্গবশতঃই মানুষ কর্ম করে। সত্ত্বগুণের মুখ্যধর্ম সুখ ও জ্ঞান। এর ক্রিয়ার ফলে মানুষমাত্রেই বিষয়সুখ ও বৈষয়িক জ্ঞানে আবদ্ধ হয়ে 'আমি সুখী', 'আমি জ্ঞানী' ইত্যাদি অভিমান করে। রজোগুণের ধর্ম আসক্তি বা আকাঙ্ক্ষাযুক্ত হওয়া। এর ক্রিয়ার ফলে তৃষ্ণা ও কামনা-বাসনায় মানুষ নানাকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দুঃখভোগ করে। আর তমোগুণের ধর্ম, মোহ ও অজ্ঞানতা। এর ক্রিয়ার ফলে মানুষ প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা প্রভৃতির দ্বারা আবদ্ধ হয়। মানবের মধ্যে সত্ত্বগুণ প্রবল হলে সকল ইন্দ্রিয়দ্বারে প্রকাশ বা নির্মলজ্ঞান উৎপন্ন হয়। রজোগুণ প্রবল হলে বিষয়স্পৃহা, সর্বদা কর্মপ্রবৃত্তি, অস্থিরতা প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। আর তমোগুণ প্রাধান্য লাভ করলে অনুদ্যম, কর্তব্যের বিস্মৃতি, বুদ্ধি বিপর্যয় ইত্যাদি লক্ষণ মানুষের মধ্যে উপস্থিত হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, সাত্ত্বিক কর্মের ফল সুখ, রাজসিক কর্মের ফল হল দুঃখ এবং তামসিক কর্মের ফল হলো অজ্ঞানতা।

প্রকৃতির পরিণামই হলো এই বিচিত্র জগৎ। বুদ্ধি, মন, দেহ, ইন্দ্রিয় (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক; পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়- বাক-কথা, পানি-হাত, পাদ-পা, পায়ু ও উপস্থ – জননেন্দ্রিয়) ইত্যাদি প্রকৃতিরই পরিণাম। বিষয় (সম্পত্তি, টাকা-পয়সা, জমি-ভূমি, গাড়ি, বাড়ি অর্থাৎ স্থাবর-অস্থাবর সবই) - এর সঙ্গে মানুষের মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সকলের সংযোগেই কর্মের উৎপত্তি। কর্ম প্রকৃতির দ্বারাই সম্পন্ন হয়। আমরা মনুষ্যরূপী জীব, তা থেকে স্বতন্ত্র বা পৃথক নই। আমরা যে মানুষ মাত্রেই 'আমি', 'আমি', 'আমি' করি তা এই প্রকৃতির গুণের কারণে। অর্থাৎ কবিগুরুর কথায়-'ছোট আমি', 'স্বার্থপর আমি', 'ক্ষুদ্র আমি', 'অসহায় আমি', 'দম্ভ- দর্প -অহংকারের আমি'। আর "বড়ো আমি' বা 'আত্মা পরমাত্মা' যাই বলি না কেন, তিনি আমাদের সকল মানুষ তথা সকল জীবের হৃদয়গুহায় অবস্থিত ("অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ আত্মনি তিষ্ঠতি" – কঠোপনিষদ) – সাক্ষীস্বরূপ, নিষ্ক্রিয়, অকর্তা, অভোক্তা, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-অসঙ্গ-অব্যয়। যে ব্যক্তি নিজেকে প্রকৃতি থেকে পৃথক বলে জানেন, তিনি প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি অর্থাৎ তত্ত্ববিদ। তিনি জানেন যে, প্রকৃতিই কর্ম করে অর্থাৎ মানুষকে বা জীবকে কর্ম করায়, 'আমি' কিছু করি না। কর্মফল আকাঙ্ক্ষা ও তাঁর থাকে না। প্রকৃতির গুণে অবশ হয়ে জীব তথা মানুষ কর্ম করে। এই প্রকৃতিতে অর্থাৎ দেহ - মন- ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে যে আত্ম-অভিমান ("আমি" অর্থাৎ ক্ষুদ্র আমি) এটিই অহংকার। জ্ঞানী

ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি অহংকারে দম্ভে-দর্পে-মুগ্ধচিত্ত তিনি মনে করেন- 'আমি কর্ম করি', অতএব, 'আমি কর্তা', 'আমিই ভোক্তা', 'আমার গাড়ি', 'আমার বাড়ি', 'আজ এটি আমি অধিকার করেছি', 'কাল ওটি আমি অধিকার করবো বা ওটি আমার হবে' ইত্যাদি । অতএব, আমরা কিছু কাজ করেই বলি 'আমি করি', 'আমি করি' আসলে এই 'আমি' হল দম্ভ-দর্প-অহংকারের 'আমি' বা স্বার্থপর 'আমি'। যে আমি নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু জানে না। এই কর্তা বা কর্মী প্রকৃত কর্মী নয়, মেকী বা নকল কর্মী। এরা মূর্তিমান ধ্বংস। কবিগুরুর কথায় বলি,

"কত বড় আমি কহে নকল হীরাটি ,
তাই তো সন্দেহ করি নহ তুমি খাঁটি।"

হৃদয় পেতে রই

ড. সর্বশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

আমরা সকলেই জানি যে বিশেষ সময়ের আরও একটা বছর অতিক্রান্ত, কিন্তু প্রায় সবকিছুই অন লাইন তথা অন্যভাবে চলমান জীবনের শর্তকে প্রবহমান রেখেছে। এটাও একধরণের ডকুমেন্টেশান, বহুদিনপরও নিজেদের খুঁজতে চেষ্টা করলে যন্ত্রজীবনের দৌলতে পাওয়া যাবে সবকিছুই, ডিজিটাল হৃদয় চিহ্নের মতোই, সবকিছু ধরা আছে সেখানে সকলের জন্যই, অনুভূতির মাত্রাগত তারতম্য মাথায় না রেখে খানিকটা অদ্ভুতুড়ে ভাবেই! আমি ও আমরা এবং তুমি ও তোমরা যাদের সম্পর্কের প্রধান শর্তটাই পরস্পরের প্রাত্যহিক চাক্ষুষ যোগাযোগ নির্ভর- তাদের মধ্যে চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন করে প্রত্যাশিতভাবে উঠে আসে এইসব আলাপচারিতা-"কি ব্যাপার কাল আসনি কেন? তুমি তো সচরাচর অনুপস্থিত হও না, বাড়ীর খবর ভালো তো?" অথবা, " কাল কিন্তু সকলে পড়ে আসবে, যতটা পড়া হয়েছে... কি বলছো, সাজেশান দিতে হবে? আগে পড়ে এস সেখান থেকেই বিভিন্ন প্রশ্ন তৈরী হবে...।" কোথায় গেল সারা বছর ধরে পরীক্ষা এবং তার প্রস্তুতির জন্য নানা আয়োজন? কিংবা, অনেকদিন পর কোন ছাত্র বা ছাত্রীকে দেখে, "... আরে কি ব্যাপার! হঠাৎ কলেজে? কোন নূতন খবর?" পাশাপাশি ওদিক থেকে কখনো বৃষ্টির ধারাপাতের মতো কলেজগেট থেকে লম্বা রাস্তা পেরিয়ে দলে দলে ছাত্র-ছাত্রীদের কলতান, রঙীন প্রজাপতির মতো তাদের বিস্তৃত ক্যাম্পাস ধরে আনাগোনা, অথবা নবীন বরণ অনুষ্ঠান থেকে শিক্ষক দিবস পালন, সরস্বতী পূজা থেকে বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কিংবা বসন্ত উৎসব ঘিরে যে পরিবেশ তৈরী হতো সেইসব প্রাণের উৎসব কোথায় গেল? সব, সবকিছুই যন্ত্র নির্ভর- কারণ তবুও বেঁচে থাকতে হবে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, সেজন্যই চলমান মানব সভ্যতার আকস্মিক এই সংকটকেও অহরাত্র চেষ্টা করে সামলে চলছে মানুষ, আবিস্কার হয়েছে টীকার, যদিও ফলাফল ও তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিতর্ক চলছেই, তবুও আপাতত তো বাঁচা সম্ভব, এমন এক বিশ্বাসে ভর করেছি আমরা, বাকীটা সময়ের হাতে।

উপরোক্ত একটা দীর্ঘ প্রেক্ষিত, কিন্তু এইবার আসল কথা, ছোট করে, মূলত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যই। এই যে আমরা যারা বেঁচে গেলাম বা এই সংকটের সময়েও টিকে রইলাম তারা কি বুঝলাম শেষপর্যন্ত? জীবন- সম্পর্ক এসব পদ্মপাতায় শিশির বিন্দু, এই আছে, এই নেই- তাহলে রইলো কি? রইলো কর্ম – ব্যক্তি থেকে পরিবার এবং তার পরেও বৃহত্তর পরিসরে বেঁচে থাকা। আমরা সকলেই ছুটে চলেছি, শুধুই কি অন্ন বস্ত্র আশ্রয়ের কারণে? এটা তো মানুষের মৌলিক প্রয়োজন, কিন্তু এর সাথে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে আরো চাই, যেকোন উপায়ে চাই –এই দানবীয় প্রবৃত্তি। প্রাচীন গ্রীক কাহিনীর প্যান্ডোরা বক্সের গল্পের কথা তোমরা জানো হয়তো অনেকেই, নিষিদ্ধ বস্তুর (আজকের বাস্তবে যা কিছুই হতে পারে) প্রতি সীমাহীন কৌতূহল ও তার পরিণতি সমগ্র মানবজাতিকে সকল প্রকার নেতিবাচক প্রবৃত্তির দাসে পরিণত করেছে, এই দাসত্ব সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত করে চলেছে বিভিন্ন সম্পর্কের মূল্যবোধকে । আমাদের সুকোমল বৃত্তিগুলি ক্রমান্বয়ে গ্রাস করে চলেছে হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, সীমাহীন আকাঙ্খা ও তা চরিতার্থ করতে যেকোন উপায়

অবলম্বনে দ্বিধাহীন, নৈতিকতাহীন ঔদ্ধত্য। এই গুলি কিন্তু যেকোন দূরারোগ্য ব্যাধির থেকেও ভয়ঙ্কর কারণ এর কোন ঔষধ বাইরে থেকে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না হৃদয় তা গ্রহণ করার মতো উপযোগী হয়, বিষয়টি অনেকটাই মহাত্মার সত্যাগ্রহ দর্শণের মতো, এই ভাবটুকু নিজের জীবন চর্চায় ধরে রাখাটাও সহজ নয়, যেকোন সময়েই পথভ্রষ্ট হতে পারে মানুষ, কিন্তু সংশোধনের সুযোগ ও উপায়টি জানা থাকলে এবং প্রয়োগ করা সম্ভব হলে আবার মানুষরূপে নিজেকে প্রমাণ করা হয়তো যেতে পারে।

এই সম্পর্কের কথাই যখন উঠলো তখন আপাতত দুটো বিষয় এখানে প্রাসঙ্গিক- প্রথমত, তোমাদের এই স্বর্ণসময়ে(কৈশোর ও যৌবন যেখানে সন্ধি করে সকলের জীবনেই, সেই কবি সুকান্তের আঠারো ছোঁওয়া প্রত্যাশা যখন প্রত্যয়ী হতে পারে সকল অসম্ভবকে সম্ভব করতে)তখন সকল নিম্নমার্গীয় প্রবৃত্তির দূষিত নিশ্বাস থেকে নিজেদের রক্ষা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও, এজন্য কোন অর্থব্যায় বা শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার দরকার পড়ে না, এ হলো পরম্পরা অর্জিত জাগ্রত বিবেক(দেশ ও কাল, সমাজ, ধর্ম ও ব্যক্তি ভেদে যদিও কিছু পারস্পরিক পার্থক্য থাকতে পারে), যখন তোমরা বা আমরা সকলকেই কোন challenge এর মুখোমুখি হই, তখন এই জাগ্রত বিবেক আমাদের "কি করণীয়" বা "কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল" সেই কথাটি একান্তে প্রতিটি মানুষকে জানিয়ে দেয় এবং সেই অনুসারে কাজ করতে পারাকেই আমরা অন্তরের নির্দেশ পালন করছি বলে থাকি- এবং তখনই আমরা সত্যিই যে কেবলমাত্র biological বৈশিষ্ট্যেই মানুষ নয়, সকল ক্লীবতার বাইরে নিজেরা মানুষ কিনা সেকথা বুঝতে পারি, কবি শ্রীজাত'র কথায় স্পষ্ট হয়ে যায় "আমরা মানুষ, তোমরা মানুষ, তফাৎ শুধু শিরদাঁড়ায়।"

দ্বিতীয়ত, তোমাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের মূল তন্ত্রীটুকু আসলে মনুষ্যত্বের এই উদ্বোধনের শিক্ষাতেই বাঁধা, কারণ সিলেবাস- পরীক্ষা- পঠন- পাঠন, অর্থনৈতিক সাবলম্বন, নূতন জীবনের নানা স্বপ্ন ও বাস্তবতা এসব কিছুর পূর্ণতা (যেগুলি বাস্তব জীবনে প্রয়োজন) তখনই সৌন্দর্য্যরূপে প্রকাশিত হয় যখন তা শুধুমাত্র শিক্ষাগত কাগুজে ডিগ্রি অর্জন বা অর্থনৈতিক মানদণ্ডের সামন্ততান্ত্রিক পরিচয়ের গণ্ডীগুলি অতিক্রম করে এবং মনুষ্যত্ববোধ নির্দিষ্ট বা বৃহত্তর সম্পর্কের সংশ্লিষ্ট মানুষগুলিকে আপন মাধুর্য্যে যথার্থভাবেই হৃদয়বন্দী করে, এই হৃদয় ডিজিটাল হৃদয়ের কারবারী নয়, নয় সহজলভ্যও, এই হৃদয় আপন দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য পালনের অলঙ্কার সজ্জিত, দূর্মূল্য ও দূর্লভ। এই হৃদয় দানের সহজ পাঠ শুরু হয় পরিবারের আঙিনায় (যাকে আমরা এক অর্থে পরিবেশ বলে থাকি), বিজ্ঞানীরা অবশ্য এর সাথে বিশেষ করে যোগ করেন ক্রোমোজোমের আধিপত্যকে। কিন্তু সবকিছুর পরেও মানুষ হিসেবে আমরা মানবজমিনকে পতিত বা বধ্যভূমিতে পরিণত হতে দেব না, এটুকুই দিনের শেষে (জীবনের শেষেও) আমাদের শিক্ষিত হওয়ার পরিচয় বহন করে।

ঐ যে যেকথা বলছিলাম যে পরিবার থেকেই শুরু হয় হৃদয় দানের সহজ পাঠ! এখন নানা বাস্তবতার কারণেই বৃহত্তর পরিবারের একত্রবাস বিশেষ দেখা যায় না

(বিশেষত পূর্ণ নাগরিক জীবনে)- বয়স্ক বাবা-মা, দাদু- ঠাকুমা, জ্যাঠা-জেঠিমা, কাকা-কাকীমা, পিসিমা-মাসীমা, মামা-মামীমা ইত্যাদি অধিকাংশ সংসারেই অচল পয়সা- হয়তোবা আছেন, দূর থেকে সামাজিক কারণে যোগাযোগ বা সৌজন্য বিনিময়ও হয়তো থাকে – কিন্তু বাস্তবে যদি তাঁদের হাত খালি হয়ে থাকে বা 'চিনির পুটলি' হস্তান্তরিত হবার কোন সম্ভাবনা না থাকে তাহলে তাঁরা অচল পয়সাই বটে! ব্যতিক্রম সব সময়েই থাকে, কিন্তু আমার কথায় সেই সংরক্ষণযোগ্য মানুষগুলির কথা নেই, সমাজের মূলস্রোতের ক্রমাগত চলমানতার অন্তরালে আসলে যে একটু একটু করে ফুরিয়ে যাওয়ার লক্ষণগুলি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেখানেই আমার পাখির চোখ! আমি এই যে সম্পর্কগুলির কথা বললাম, এগুলির মধ্যে আজকের দিনে সবথেকে প্রত্যক্ষ ও বিপদাপন্ন হলেন বাবা-মা। অথচ আমরা অভিজ্ঞতায় দেখেছি কত কষ্ট করে সন্তান প্রতিপালন করেন মানুষ। কিন্তু মানুষ হওয়ার মাপকাঠি কি কেবলমাত্র উচ্চ পদ লাভ ও প্রচুর অর্থ উপার্জন হতে পারে? আমরাও, যাঁদের তোমরা শিক্ষাগুরুরুপে স্বীকার করে চলেছ ইতিহাসের সেই কোন সুদূর অতীত থেকে, আমরাও কি অস্বীকার করতে পারি সমাজের এই অবক্ষয়ের দায়? অবশ্য এমন পরিবার, ছাত্র-ছাত্রী দেখেছি যেখানে সাধারণ অর্থনৈতিক ক্ষমতা নিয়েও পরিবারের সম্পদ হলো সম্পর্কের জমাট বুনন, যথার্থ শিক্ষিত হওয়ার সার্থক বাস্তবতা। সেই টুকুই আমার মূল কথা, শিক্ষার উদ্বোধন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা হোক হৃদয় মন্দিরে- সংবাদপত্র, দূরদর্শনসহ বিভিন্ন সোশাল মিডিয়ায় বারংবার উঠে আসছে অসহায় বাবা-মায়ের কথা – একই সংসারে থেকেও প্রতিষ্ঠিত সন্তানদের ঔদাসিন্য বৃদ্ধ মানুষদের কতটা একাকী- গুরুত্বহীন করে দেয় সেকথা আজ আর নূতন করে বলার অপেক্ষা রাখেনা - বৃদ্ধাশ্রমে জোরপূর্বক পাঠানো থেকে (সব সময় না হলেও) কোন অচেনা নির্জন স্থানে তাঁদের রেখে আসা, আবার কোন কোন সময় শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সহ তাঁদের আতংকের দিন যাপন করতে হয় অথবা চূড়ান্ত দানবীয় প্রবৃত্তির প্রকাশ ঘটে যখন সম্পত্তির জন্য পরিকল্পনা করে তাঁদের হত্যা পর্যন্ত করা হয়- এ কোন পৃথিবীতে বাস করছি আমরা? মনে পড়ে যায় যে ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায় বিচার এবং ক্ষমতায়ন দপ্তর থেকে জারি হওয়া Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 এর কথা, যেখানে পুত্র / কন্যা/ জামাতা/ পুত্রবধূ/ অথবা নিঃসন্তান মানুষ হলে তাঁর বা তাঁদের আইনত উত্তরাধিকারী আত্মীয়স্বজন - সকলকেই পিতা-মাতা এবং বয়স্ক মানুষদের রক্ষাবেক্ষনসহ তাঁদের ভালো রাখার বিষয়টির উপর দায়বদ্ধ থাকতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আইন কি হৃদয়ের উপরে? সম্ভবত নয়, সেকারণেই হৃদয় রক্তাক্ত হয়ে খান খান হলেও পিতা-মাতা সন্তানের বিরুদ্ধে আইনের দ্বারস্থ হয়েছেন এমন উদাহরণ নিতান্তই স্বল্প। আমাদের ভারতীয় পরম্পরায় তিনটি প্রজন্মের মানুষও একসাথে বাস করেছেন, বটগাছের মতো মাথার উপরে থেকেছেন বয়স্করা, সংসারের সকল তাপপ্রবাহ থেকে রক্ষা করেছেন শিশু বা তরুণ প্রজন্মকে- পরবর্তী প্রজন্ম শিখেছে কীভাবে পরিবার ও সমাজকে রক্ষা করতে হয়, তখনো বোধহয় প্যান্ডোরা বাক্সটি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়নি, আমরা আমাদের প্রবৃত্তিকে কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছিলাম, ব্রাত্য হয়ে যায়নি মনুষ্যত্বের অঙ্গীকার। সেই মনুষ্যত্ব আজ বিপন্ন, আমাদের হৃদয়জুড়ে তার আসন আজ শূণ্য- সেই রাজার ইচ্ছাপূরণের মতো! সকল কিছু স্বর্ণরুপ ধারণ করতে করতে নিজ কন্যাও প্রাণহীন স্বর্ণপ্রতিমা হয়ে উঠলে রাজার হাহাকার শুরু হয়েছিল, সেরকমই

রবীন্দ্রনাথের ‘তোতাকাহিনীর’ প্রাসঙ্গিকতা আজও অমলিন, হয়তো একটু অন্যভাবে- আমরাও তোতা পাখীর মতো, ক্রমান্বয়ে শিক্ষিত হয়ে চলেছি (সেই শিক্ষা কোন কোন সময় আমাদের ধনী- স্বর্ণশৃঙ্খলাবদ্ধও করেছে), কিন্তু সেই দিনটি যদি আসে - যখন আর পাখীটির মতো আমরা উড়বো না, গান গাইবো না, হাঁ- হুঁ করবো না, কেবল সামাজিক আবর্জনা বস্তুর মতো খস খস করবো, সেইদিন এই শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীর সম্পর্কটির কঙ্কালসার হয়ে পড়ার আশঙ্কাই আমার আজকের এই লেখার চালিকাশক্তি, যা শেষপর্যন্ত অলক্ষ্যে সাবধান করে, জাগ্রত বিবেকের পদধ্বনি শোনার আশায় হৃদয় পেতে রাখে।

সূ-যোগ

ড. রাজর্ষি কয়াল
সহকারী অধ্যাপক, শারীরশিক্ষা বিভাগ
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

আক্ষরিক অর্থে সম্ভবনা বা উদ্দেশ্য বোঝাতে সুযোগের যে বানান ব্যবহার করা হয়, শিরোনামের সূ-যোগ সরাসরি ঠিক তেমনি নয়। বরং দুটো শব্দ - সূর্যের 'সূ' আর 'যোগ' - এর মিশ্রিত এক রূপ। আর সূ এর জায়গায় যদি সু লেখা হত,তাহলে বলা যেত সু-যোগ। তখন ভাবাই যেত যোগের সুযোগ সুবিধার কথা। অবশ্য সূ থাকাতে কি সে আলোচনা করা যায় না! যেতেই পারে। তথাকথিত যোগচর্চা সূর্যানমস্কার দিয়েও শুরু হতে পারে।

কোভিডকালে যেমন 'ই' যুক্ত শব্দ ও শব্দের ব্যবহারিক প্রয়োগ বেশি বেশি হচ্ছে, তেমনি হ্যান্ডশেকের বদলে শুদ্ধ ভারতীয় সংস্কৃতি জোড় হাতের নমস্কার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আজ সর্বজনবিদিত। আর সপ্তম বিশ্ব যোগ দিবস পেরিয়ে আমরা যোগী না হলেও কম বেশি যোগ বিশারদ। বলা ভালো 'যোগা' বিশারদ। সোশ্যাল মিডিয়ার বন্ধু, তার বন্ধু বা তারও হাজার বন্ধুর হাজার হাজার রকমের 'যোগা' -র ছবি সত্যিই যোগ অনুশীলনে অনুপ্রাণীত করে। আর ১০৮ সূর্যনমস্কার হলে তো কথাই নেই, শুধুই লাইক–কমেন্ট–শেয়ার। বেশি কিছু জানতে চাইলে 'ইনবক্স' করুন।

নামমাত্র রেজিস্ট্রেশন ফি-তে এক সপ্তাহ বা এক মাসের 'ই' ওয়ার্কশপ। কে বা কারা করাচ্ছে? কেন জান না! আয়ূষ মন্ত্রকের কতশত সংস্থা থেকে YCB ট্যাগ লাগানো ট্রেইনার Level 1: Yoga Protocol Instructor, Level 2: Yoga Wellness Instructor এবং Level 3: Yoga Teacher and Evaluator. সঙ্গে আছে 200 Hours Yoga Certified Teacher এবং RYT মানে Registered Yoga Teacher by Yoga Allience U. S. তাছাড়াও আছে দেশীয়, প্রাদেশিক বা জেলা বা ব্লক বা পাড়ার বিভিন্ন সংগঠন। আর একটু বেশি খোঁজ করলে জানতে পারবো যে এখন অনেক বিশ্ববিদ্যালয় যোগের ওপর ডিপ্লোমা, পি. জি. ডিপ্লোমা, ডিগ্রী, মাস্টার ডিগ্রি, এম. ফিল., পিএইচ. ডি. কোর্স করাচ্ছে। যদিও মহর্ষি পতঞ্জলিদের এমন ডিগ্রির দরকার নেই।

আয়ুর্বেদ - আয়ূষ মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন বলে সহজে ভেবে বোস না যে যোগের কোনো সাইড এফেক্ট নেই। বেলা হলেই টের পাবে। তবে একটু শিখে পড়ে নিলে কেবলমাত্র দৈহিক জ্বরা-ব্যাধি-মৃত্যুর প্রকোপ থেকে কিছুটা হলেও রেহাই পাবো তা নয়, পাশবিক আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথূন ছেড়ে 'সত্য' বাবুর কাছে পৌঁছতে পারি।

শাস্ত্রে বলা আছে যে সত্যবাবুর কাছে পৌঁছতে হলে 'ছাড়তে' হবে। যোগের শিক্ষক মহাশয়রা বলেন, "সোজা হয়ে বস, চোখ বন্ধ কর। এবার ভাব, আমি কে?" প্রথমে বাদ দাও তোমার পদ - ডিগ্রি (যদি থাকে), তারপর একে একে পিতৃদত্ত পদবি, তোমার নাম, শেষে শারীরিক অস্তিত্ব। অনুভব কর তোমার সূক্ষ অস্তিত্ব। কে তুমি? কোথা থেকে এসেছ? তোমার কাজ কি?..... এত সহজে যদি PLR (Past Life Regression) হত,

তাহলে প্রাচীন মুনি ঋষিরা সব কিছু ছেড়ে দিয়ে হিমালয়ে চলে যেতেন না। অবশ্য ঋষি অরবিন্দ যোগসমন্বয়ে বলেছেন, সংসার না ছাড়লেও যোগ হতে পারে। তবে তার জন্য হয়ে উঠতে হবে(becoming), তৈরি হতে হবে। আর তৈরি হতে গেলে ছাড়তে হবে, বাদ দিতে হবে। একটা যোগ হতে গেলে অন্ততঃ দুটো বিয়োগের দরকার।

পথও তাঁরা দেখিয়ে গেছেন অনুসরণ করার জন্য - অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ আর শৌচ-সন্তোষ-তপ-স্বাধ্যায়-ঈশ্বর প্রণিধান। স্বামীজির কথায় বলতে হয়, ওপরে উঠতে গেলে হাল্কা হতে হয়। না ছাড়লে হাল্কা হবে কিভাবে? অবশ্য 'ছাড়া' টা অত্যাধুনিক সমাজে না -পসন্দ। এখন তো buy one get one or more অথবা Add-on প্রায় সবকিছুতেই। আরো চাই, অনেক চাই, অনেক অনেক চাই।

কোনো দিক থেকে পিছিয়ে পড়া যাবে না। যোগা করতে হয়, নইলে পিছিয়ে পড়তে হয়, অন্ততঃ করতে না পারো দেখাতে হয়।সেই ছেলেটা এক পায়ে যোগা করছে, আমাকে দু পা তুলে করতে হবে। একটি ছাত্রী মাঠে অনুশীলন করছে, তো আর একজন বাড়ির ছাদে দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, দেখাতে হবে, সোশ্যাল মিডিয়ার গ্রুপে গ্রুপে দেখাতে হবে। অদ্ভুত এক সার্কাস। যে পারছে, যেখানে পারছে, যেমন ভাবে পারছে আসন করছে। অথচ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা আছে যে, যে স্থান সমতল ও পবিত্র, যেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড, অগ্নি বা বালুকা নেই, যে স্থান মধুর শব্দ, জল ও আশ্রয়াদি দ্বারা মনোরম এবং চক্ষু-স্নিগ্ধকর – এইরূপ বায়ুবেগশূন্য গুহা প্রভৃতি স্থানে উপবিষ্ট হয়ে মনকে পরমাত্মায় সমাহিত করবে।

অনেকে বলবে, এটাতো আর উপনিষদের কাল নয়, এমন জায়গা পাবো কোথায়? এমন জায়গায় দেখাবো কাকে? অতশত মানতে পারবো না। অংশগ্রহন করছি সেটাই যথেষ্ঠ। ইম্প্রভাইজেশন দরকার। শারীরশিক্ষার ছাত্র হিসাবে অস্বীকার করতে পারি না অংশগ্রহন ও ইম্প্রভাইজেশন, কিন্তু যোগের শিক্ষার্থী হিসাবে ভয় পাই। যোগের বাণিজ্যিকীকরণ ও পাশ্চাত্তায়নে সূর্যদেব যেন পূর্ব থেকে সরে না যান।

।।ওঁ মিত্রায় নমঃ।।

স্মৃতিপটে একটি নাম

ড. গোপাল কৃষ্ণ গাঙ্গুলি
সহযোগী অধ্যাপক, গণিত বিভাগ, কল্যাণী মহাবিদ্যালয়
(প্রাক্তন রীডার, গণিত বিভাগ, পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়)

সব মানুষেরই বয়েস বাড়ার সাথে সাথে ছোটবেলার স্মৃতি গুলো মনের আনাচে কানাচে উকি ঝুঁকি মারে।সেই স্মৃতি থেকে এক টুকরো আজ পরিবেশন করতে চাই, তাতে সুখ দুঃখ উভয়েরই মিশ্রণ থাকবে।

আমার বাড়ির পাশে একটি আশ্রম ছিল, আমাদের বড় হওয়া সে আশ্রম কে কেন্দ্র করে। আশ্রমের রীতিনীতি অনুশাসন আমরা মেনে চলতাম , তাতে আমাদের জীবনে শৃঙ্খলার যেমন অনুশীলন হতো পাশাপাশি ওই জীবনের একটি আত্মতৃপ্তিও ছিল। ওই আশ্রমে আর পাঁচটা আশ্রমের মত বহু মানুষের আনাগোনা ছিল, কেউ কেউ আবার আবাসিক হিসেবে থেকে যেতেন , তাদের প্রত্যেকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন ছিল, সবার কথা আজ আর মনে পড়ে না। কিন্তু ওই মানুষ গুলোর মধ্যে একজন আমার কাছে ধ্রুব তারার মত ভাস্বর। আজ চোখ বন্ধ করে তার উপস্থিতি অনুভব করি। বিশেষ পরিচয় দেবার মত কিছুই তার ছিল না, শুধু বলেছিলেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ওনার সহপাঠী ছিলেন। ছোটবেলায় বেলেঘাটাতে থাকা, খেলাধুলা , বিশেষত ক্রিকেট, সঙ্গীত চর্চা, পড়াশোনা একইসাথে দক্ষতার সঙ্গে করতেন। ভাগ্যের বিপর্জয়ে এই প্রতিভাবান মানুষটি আমাদের আশ্রমে এসে হাজির হন, তার যাবতীয় খরচ বহন করতেন তার অগ্রজ। আশ্রমে তো আর ক্রিকেট খেলা হয় না, হয় না তেমন সঙ্গীত চর্চা, তাই তিনি আশ্রমের কৃষি কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। যদিও আজীবন শহরবাসী মানুষটির এব্যাপারে কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু তিনি তো সঙ্গীত পাগল! এতে কি তার মনের খিদে মেটে! তাই আশ্রমে প্রার্থনা শেষে সঙ্গীতের সুর তাল লয় সম্পর্কে ছোট ছোট গল্প করে কমলমতি ছেলে মেয়েদের বোঝাতেন। ধীরে ধীরে তিনি সবার নয়নের মনি হয়ে উঠলেন। আর তার সৃষ্টিসুখের উল্লাসের অভিব্যাক্তি ওই ছোট বয়েস বুঝতে পারতাম। তখন থেকে কেমন করে জানি না ভারতীয়ও শাস্ত্রীয় সংগীত-এর প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা জন্মে গেলো। এমন করেই হয়তো প্রকৃত গুরু বিষয়ের প্রতি ভালোবাসা জন্মে দিতে পারে। নিজের জীবনে সেই চর্চা আর করে ওঠা হয়নি, শুধু ভালোবাসাটাই টিকে রয়েছে। যাক সে কথা, সৃজনশীল মানুষরা সবসময় অতৃপ্ত থাকেন। তাই হয় তারা এগিয়ে চলেন নতুবা বিষণ্ণতার শিকার হন। তার জীবনে দ্বিতীয়টি নেমে এসেছিল। একদিন পরন্ত বেলায় কণ্ঠে সুরের বদলে তুলে নিলেন বিষ, আর তাকে ফেরান গেলো না, চলে গেলেন না ফেরার দেশে।

আজ থেকে অর্ধশতাব্দী আগে চলে যাওয়া খোকনদাকে চোখ বুজে দেখতে পাই, গুনগুন করে তার সৃষ্টিকে অপরিশিলিত কণ্ঠে তোলার চেষ্টা করি।

প্রহরী

শিবনাথ মুর্মু
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

যৌবন উত্তীর্ণ
তবুও বাল্য স্মৃতির হাতছানি।
ফুল ফল, জল কাদায় ভরা
আমার সেই গ্রাম।
ব্যাকুল মন ক্ষণ মাত্র
যায় না দূরে।
জীবন কন্টকাকীর্ণ
ইচ্ছা অনিচ্ছার বিসর্জন
ফেলে আসা মায়ের মুখ।
জীবন প্রবাহিত
ব্যাস্ততা আর প্রয়োজনীতা,
প্রতিষ্ঠা আর প্রস্তুতির দন্দ্ব।
বিচ্ছেদ, বেদনা, মহামারী
এখানে মৃত্যু
ফর্মালিটির হুইল চেয়ারে বসে।
ধারালো কলমের মুখো মুখি
সদা জাগ্রত সৈনিক।

কে তুমি

প্রণব কুমার মাইতি
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

অধরে মেখেছ তুমি পরিপক্ক বিম্বফলের ঘ্রাণ
চিনতে পারিনি, তুমি কি সেই ?
না কোন এক উদ্ ভ্রান্ত মেঘ বালিকার গান ।
কতবার দেখেছি তোমায় বাসে, ট্রেনে, ক্লাসে,
সিঁড়ির নিচে, কোলাহলে, ছাতিমতলায়, ক্যান্টিনে,
খাওয়ার টেবিলে বুঝতে পারানি, তুমি কি সেই?
না কোন এক রাজকন্যার ভিজে সুশীতল হাত ।
দুহাতে পরেছ তুমি বন্ধনহীন কনক কুসুম চুড়ি,
কানে দুলিয়েছ তুমি অন্ধ বাউলের একতারা ।
কতবার দেখেছি তোমায় দূর থেকে বারান্দায় রোদ্দুরে,
তুমি কি সেই? না কোন এক বলাকার সমুদ্র স্নান ।
চিবুকে মেখেছ তুমি গোধূলির উষ্ণ পরাগরেণু,
আর দুপুরের ক্লান্ত রৌদ্রের অভিমানে বুঝতে পারিনি
তুমি কি সেই? না কোন এক হালভাঙা নাবিকের নীলকণ্ঠ পাখির পালক।

ন্যান্সী শোডোরো

সুজাতা মাইতি
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, ইতিহাস বিভাগ
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

ন্যান্সী শোডোরোর মতে, নারীসত্ত্বা অনেক সহজেই স্বীকৃতি পায়। মেয়েরা সন্তান ধারণ করেন বলে পুত্র সন্তান পুরুষে পরিণত হতে যা সময় নেয়, তার তুলনায় কন্যা সন্তান অনেক সহজেই নারীসত্ত্বা লাভ করে। কিন্তু পুত্র সন্তানকে মায়ের সঙ্গে একাত্মতাকে ছিন্ন করে অন্য পুরুষের সঙ্গে একত্রিত হতে হলে সচেতন প্রয়াস নিতে হয়, না হলে তার কপালে জোটে 'মায়ের আঁচলের তলায়' জীবন কাটানোর জন্য ব্যঙ্গ। পুত্র থেকে পুরুষে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে সামজিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এই অনুষ্ঠানের অঙ্গাঙ্গী হল রক্তপাত এবং অন্যান্য ধরনের যন্ত্রণাদায়ক আচার। কারণ পুরুষ বলে স্বীকৃতি পেতে হলে সহনশীলতা দেখাতে হবে।

নারী যেমন ঋতুমতী হয়ে সন্তান ধারণের মধ্য দিয়ে তার নারীত্বকে প্রতিষ্ঠা করে, পুরুষের ক্ষেত্রে অনুরূপ কোনো প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া নেই। কারণ তাকে কোন কার্য সম্পাদন করে পৌরুষের স্বীকৃতি পেতে হবে। পিতৃত্বের স্বীকৃতির জন্য পুরুষকে নারীর উপর নির্ভর করতে হয়, তাই মনস্তাত্ত্বিক এরিক এরিকসন বলেছেন, পুরুষের পুরুষ প্রাধান্য রক্ষার জন্য এত জোর-জুলুমের কারণ হলো নারীর প্রতি ঈর্শা - যে নারী তার মাতৃত্ব সম্বন্ধে সব সময় নিশ্চিত, কিন্তু পুরুষ নারীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করলে তবেই নিজের পিতৃত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারে। ন্যান্সী শোডোরোর মতে র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীরা বলেছেন মেয়েদের পুরুষকে ভয় পাওয়ার তুলনায় পুরুষদের মেয়েকে ভয় পাওয়ার কারণ অনেক বেশি। তিনি আরো এগিয়ে বলেছেন যে, এই ভয়ই সুদূর অতীতে যুদ্ধের সৃষ্টি করেছিল । সন্তান ধারণের ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে যুদ্ধ এবং যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে পুরুষ নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিল। সভ্যতার ইতিহাস পুরুষের সেই সচেতন প্রয়াস এর ইতিহাস।

মিচেল বলেছেন, পরিবার প্রথা ভেঙে গেলে মুক্তি আসবে। শোডোরোর মতে, শিশু পালনে সংস্কার, বিভাজন কমাবে। এখান থেকে একটা আশঙ্কা থাকে যে, নারীর মৌলিক নারীত্ব, স্বনির্ভর তৃপ্তির উৎসের সন্ধান, মা মেয়ের সম্পর্ককে খুঁটিয়ে দেখা, তার সন্তান ধারণ, তার অবশ্যম্ভাবী মাতৃত্বের কাছে ফিরিয়ে দিচ্ছে না? পশ্চিমী সমাজের বৈভব, আইন, বিচার- ব্যবস্থা, প্রশাসন এবং কর্মস্থলে আপাত সমতার প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও বৈষম্য থেকে যাচ্ছে। যেখানে এই ধরনের বাস্তববিমুখ, বিমুর্ত আত্মানুসন্ধানের প্রাসঙ্গিকতা থাকতেই পারে।

এখানে এই দাবি নেই যে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন জৈবিক পার্থক্য নেই বা ভবিষ্যতে লোপ পাবে। উনি শুধু বলতে চেয়েছেন পৃথিবী জুড়ে পুরুষ শাসন কায়েম হয়েছিল কেন? সে সম্বন্ধে কোনো ব্যাখ্যা কতদূর স্বীকৃত বা বিতর্ক কোথায় আছে? হয়তো সে বিতর্ক কে অত্যন্ত সরল ভাবে, মোটা দাগে প্রকাশ করতে গিয়ে তাদের প্রতি কিছুটা অবিচার ও করা হয়েছে। পুরুষ আগ্রাসী, নারী আজ্ঞাবহ হবে সেটা প্রকৃতি, জীন, হরমোন বা অবচেতনের বিধান হয়েও থাকে, সেটাকে মান্য করতে হবে কে বলেছে? খাদ্য সংগ্রহ

থেকে কৃষি শুরু হওয়ার ব্যাপারটাই তো প্রকৃতির বিধানকে প্রথম অমান্য করা। তারপর সভ্যতার ইতিহাস পদে পদে প্রকৃতির বিধানকে অমান্য করারই ইতিহাস। আজ চিকিৎসার মাধ্যমেই মানুষ বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কে বাড়িয়েছে, গর্ভনিরোধক পিল খেয়ে নারীর সন্তান সম্ভাবনাকে রোধ করেছে। তাহলে শুধু নারীর হীনতার ক্ষেত্রে প্রকৃতির বিধানের দোহাই কেন দেওয়া হবে? মানুষ যদি তার অধ্যয়ন, সামাজিক অনুশাসনের মাধ্যমে বারবার প্রকৃতির বিধানকে অতিক্রম করতে পারে, তাহলে আজও ২১ শতকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নির্জন রাস্তায় একা হাঁটা, কোন এক নারীর দূরাহত স্বপ্ন থেকে যায়?

মনের আশা

চয়ন কুমার মন্ডল
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, ভূগোল বিভাগ
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

জীবনের প্রথম দেখাতে
মনের মধ্যে বয়ে গিয়েছিল এক ঝড়।
যে ঝড়ের মধ্যে গড়ে ওঠে
ভালোবাসা আর ভালোবাসা।
সেরূপ আমিও চেষ্টা করেছিলাম
দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ হতে,
চেষ্টা করেছিলাম তোমায় নিয়ে স্বপ্ন দেখতে...
আর মনের মধ্যে ভালোবাসার মালা গাঁথতে।
কিন্তু তোমার মধ্যে সেই মুহূর্তে,
কোনো প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন দেখতে পেলাম না।
ক্রমে ক্রমে মনের মধ্যে হতে লাগল
সংকোচ বোধ...
হাওয়ার স্তব্ধতাতে গাছেদের মধ্যে
যেমন ছিঁড়ে যায় ভালোবাসা বোধ
সেরূপ আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে গিয়েছিল।
ভেঙ্গে গিয়েছিল আকাঙ্খা
আর ভালোবাসা বোধ...
কিন্তু, তোমায় আমি ভুলতে পারিনি
ভুলতে পারিনি তোমার মুখখানি।
জানি না তুমি কারে করেছো চয়ন-
ফুলের রূপময় গন্ধকে,
না কণ্টকযুক্ত পথকে ?
তসব আকাঙ্খা আর তোমার ভালোবাসা,
আমার মনকে করেছে ভারাক্রান্ত
কিন্তু তুমি কে?
তোমার জন্য আমার মনে ওঠে সমুদ্রের মত স্ফীতি।
তোমার প্রতি কল্পনাময়ী মন নিয়ে
আমার এখানে লেখার ইতি।

‘জাদুকর’ জর্জ মেলিস ও বিশ্বের প্রথম কল্পবিজ্ঞান চলচ্চিত্র ‘আ ট্রিপ টু দ্য মুন’

অর্পিতা সামন্ত
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, ভূগোল বিভাগ
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

কল্পনা এবং বিজ্ঞান যেখানে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়, তাই হল কল্পবিজ্ঞান। বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে কল্পনা যখন ডানা মেলে স্রষ্টার আপন মনের মাধুরীতে রাঙানো আকাশে, তখনই লেখা হয় কল্পবিজ্ঞানের গল্প, সৃজিত হয় কল্পবিজ্ঞানের চলচ্চিত্র। স্থির চিত্র রূপোলি পর্দার বুকে চলমান হওয়ার মাত্র আট বছরের মধ্যেই জন্ম নিয়েছিল প্রথম কল্পবিজ্ঞান ভিত্তিক চলচ্চিত্র। ১৯০২ খ্রীঃএ কিংবদন্তি ফরাসী চলচ্চিত্র নির্মাতা জর্জ মেলিস তৈরি করে ফেলেছিলেন ‘লে ভয়েজ দ্যঁস লা লুন’ (ফরাসী) বা ‘আ ট্রিপ টু দ্য মুন’ (ইংরেজী) নামক সেই যুগান্তকারী চলচ্চিত্রটি। মানুষের চন্দ্রাভিযানের এক কাল্পনিক কাহিনীকে চলচ্চিত্রের সেই আদি যুগে মেলিস অবিশ্বাস্য ভাবে রূপোলী পর্দায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন; তিনি তাঁর ফিল্মে একটা আস্ত স্পেসক্র্যাফ্টকে সোজা নামিয়ে দিয়েছিলেন চাঁদের মাটিতে!

১৮৬১ খ্রীঃ এর ১৮ই ডিসেম্বর ম্যারি জর্জ জঁ মেলিস জন্মগ্রহন করেন প্যারিসের এক সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী পরিবারে। প্রথাগত শিক্ষা শেষ করার পরে মেলিস কিছুদিন পারিবারিক ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশী করেন। এরপরে তিনবছর বাধ্যতামূলক সামরিক সার্ভিসে কাটান তিনি। তারপরে লন্ডনে ইংরেজী ভাষা ভালোভাবে আয়ত্ত করতে গিয়ে মেলিস আকৃষ্ট হলেন ম্যাজিক বা জাদুবিদ্যার দিকে। আসলে মেলিস ছোটবেলা থেকেই শৈল্পিক সৃষ্টিশীলতার দিকে তীব্র আকর্ষণ বোধ করতেন, ব্যবসায় তাঁর খুব একটা আগ্রহ ছিল না। তিনি প্যারিসে কিছুদিন ছবি আঁকাও শিখেছিলেন।

১৮৮৮ খ্রীঃ এ পারিবারিক ব্যবসা সূত্রে প্রাপ্ত অংশীদারিত্ব বিক্রি করে দিলেন মেলিস এবং প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে প্যারিসের বিখ্যাত ‘রবার্ট-হুডিন থিয়েটার’টি কিনে নিলেন। এরপরে সেখানে তিনি পাকাপাকি ভাবে ম্যাজিক দেখাতে শুরু করলেন। অধীত বিদ্যা, নিজের সৃষ্টিশীল চিন্তাভাবনা এবং চিত্রকলার জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মেলিস তাঁর ম্যাজিককে করে তুললেন আধুনিক, আকর্ষণীয় ও শিল্পসম্মত। পরবর্তী বছর দশেক মেলিস, ফ্রান্স তথা ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ম্যাজিসিয়ান হিসাবে প্রভূত যশ ও অর্থ লাভ করেন।

এইভাবে কেটে গেল বেশ কিছুকাল। ভিতরে ভিতরে মেলিসের শিল্পী মন তাগাদা দিতে আরম্ভ করল ম্যাজিকের বাইরে নতুন কোনো সৃষ্টিশীল মাধ্যমের অনুসন্ধান করার জন্য।

ইতিমধ্যে বিখ্যাত ল্যুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয় ১৮৯৫ খ্রীঃ এ মার্চ মাস থেকে প্যারিসের বিভিন্ন জায়গায় চলমান চিত্রের প্রদর্শনী শুরু করেন। এতে বিপুল আলোড়ন পড়ে গেল চারিদিকে। খবরটি মেলিসের কানেও গিয়েছিল। কৌতূহলী মেলিস একদিন দর্শক হয়ে গেলেন এমনই একটি শো’য়ে। তারিখটা ছিল ১৮৯৫ খ্রীঃ এর ২৮ শে ডিসেম্বর। ব্যাস,

মিরাকল ঘটে গেল মেলিসের জীবনে। সেই যে চলচ্চিত্রের মোহ আবর্তে পড়লেন তিনি, তারপরে আর পিছন ফিরে তাকাননি। মনপ্রাণ সব সঁপে দিলেন ফিল্ম নির্মাণে।

১৮৯৬ খ্রীঃ এর আগস্ট মাসে মুক্তির আলো দেখল তাঁর তৈরি প্রথম ফিল্ম – 'প্লেয়িং কার্ডস', যার দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ৬৭ সেকেন্ড। ঐ বছরই মেলিস তৈরি করলেন তাঁর নিজস্ব প্রযোজক ও পরিবেশক সংস্থা 'স্টার ফিল্ম কোম্পানি'।

১৯০২ খ্রীঃ এর মধ্যে জর্জ মেলিস তৈরি করে ফেলেন ২৫০ টির বেশি ফিল্ম,যদিও সেগুলি সবই ছিল খুবই স্বল্প দৈর্ঘ্যের এবং কোনও তাৎক্ষনিক বাস্তব ঘটনার চিত্রায়ন। কিন্তু মেলিসের ইচ্ছা ছিল তুলনায় অধিক দৈর্ঘ্যের এবং কাহিনী বা ন্যারেটিভ নির্ভর ফিল্ম তৈরি করার। সেই উদ্দেশ্যে তিনি মাথা খাটিয়ে ১৯০২ খ্রীঃ এর গোড়ার দিকে একটি কাহিনী ও চিত্রনাট্য খাড়া করে ফেললেন। কাহিনীটি কিন্তু কোনও প্রেম–ভালোবাসা কিংবা যুদ্ধ-বিগ্রহ কিংবা রাজনৈতিক আখ্যানের ভিত্তিতে লেখা হয়নি; বরং কল্পবিজ্ঞানকে ভিত্তি করে, মানুষের চিরকলীন এক ফ্যান্টাসি – সশরীরে চন্দ্রাভিযান - ছিল এর মূল উপজীব্য। মেলিস নাম দিলেন 'লে ভয়েজ দ্যঁস লা লুন' (ফরাসী) বা 'আ ট্রিপ টু দ্য মুন' (ইংরেজী)।

জর্জ মেলিস পরবর্তীকালে স্বীকার করেছিলেন যে কাহিনীটির অনুপ্রেরণা ছিল তাঁর প্রিয় লেখক জুলে ভের্ন এর দু'খানি উপন্যাস – 'ফ্রম দ্য আর্থ টু দ্য মুন' এবং 'অ্যারাউন্ড দ্য মুন'। তবে ফিল্ম তাত্ত্বিকরা বলেন যে, কাহিনীর শেষাংশের সঙ্গে এইচ.জি.ওয়েলসের বিখ্যাত উপন্যাস 'দ্য ফার্স্ট মেন ইন দ্য মুন' এরও বেশ সাদৃশ্য আছে।

ফিল্মের আখ্যানভাগটি সংক্ষেপে এইরূপ :- প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ প্রোফেসর বার্বেনফৌল্লিস একটি চন্দ্রাভিযানের পরিকল্পনা করেছেন। অনেক ঝাড়াই বাছাই এর পরে তিনি তাঁর সঙ্গী নভশ্চর হিসাবে আরও পাঁচজনকে নির্বাচিত করেন, এরা হল- নস্ত্রাদামুস, মাইক্রোমেগাস, অ্যালকোফ্রিসবাস, ওমেগা ও প্যারাফারাগ্রামুস। অভিযানের জন্য তৈরি করা হল বুলেট আকৃতির এক বিশেষ মহাকাশযান। নভশ্চরদের তার মধ্যে ঢুকিয়ে, সেটিকে একটি বিশাল কামানের মুখে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। পরে এক সৈনিক কামানে আগুন দিতেই হাউই বাজির মতো চন্দ্রযানটি আকাশপানে ধাবিত হল। আকাশে তখন চাঁদমানুষের হাসি মুখ। সেই বুলেটাকৃতি চন্দ্রযান সোজা চাঁদমানুষের চোখে ঢুকে গিয়ে 'ল্যান্ড' করল। এরপরে ঐ ছয় নভশ্চর চন্দ্রযান থেকে বেরিয়ে চাঁদের মাটিতে ঘুরে বেড়ান। সেখান থেকেই প্রত্যক্ষ করেন পৃথিবীর উদয়, শনি, ধূমকেতু ইত্যাদি। এমন সময় তুষার ঝড় শুরু হলে তাঁরা একটি গুহায় আশ্রয় নেন। সেখানে আবার বড়ো বড়ো ব্যাঙের ছাতা। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আবির্ভাব ঘটে বিচিত্র চেহারার চাঁদের অধিবাসীদের। ধুন্ধুমার যুদ্ধ বেধে গেল দুই পক্ষের মধ্যে। একটু জোরে আঘাত করলেই চাঁদের জীবেরা 'ফটাস' করে ফেটে গিয়ে, ধোঁয়া বেরিয়ে যাচ্ছিল। তবুও চাঁদের জীবেদের কাছে নভশ্চররা হেরে গেলেন। তখন তাঁদের নিয়ে যাওয়া হল ঐ জীবেদের রাজার কাছে।

রাজদরবারে বাদানুবাদের পরে এক নভশ্চর খোদ রাজাকেই তুলে দিলেন এক আছাড়, রাজাও গেল ফেটে। আর সেই ডামাডোলে নভশ্চররা দিলেন দে ছুট, চন্দ্রযানের দিকে। পিছনে তেড়ে এল চাঁদের জীবরা। পাঁচজন নভশচর ঢুকে পড়লেন যানে। স্বয়ং প্রোফেসর বার্বেনফৌল্লিস চন্দ্রযান থেকে ঝুলন্ত একটি দড়ি ধরে ঝুলে পড়লেন। ঠিক ঐ সময়ে একজন চাঁদের জীবও দৌড়ে এসে চড়ে বসল চন্দ্রযানের ওপরে। দড়ির টানে চন্দ্রযানটি এসে পড়ল পৃথিবীর এক সমুদ্রে। একটি জাহাজ তাঁদের উদ্ধার করে। এরপরে চাঁদফেরত নভশ্চরদের সম্মানে একটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয় এবং সেখানে চাঁদের জীবটিকেও হাজির করা হয়। সেখানে একটি সম্মানজ্ঞাপক কুচকাওয়াজ ও স্মৃতিস্তম্ভফলক উন্মোচনের মাধ্যমে ছবিটি শেষ হয়। এই ফলকে লেখা ছিল 'Labor Omnia Vincit' অর্থাৎ 'Work Conquers All' ।

আজকের আধুনিক, সংস্কৃতিমান, রুচিশীল মননের কাছে হয়ত এই 'ন্যারেটিভ' পরিহাস তরল মনে হতে পারে, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে তখন চলচ্চিত্র শিল্পের একেবারে শৈশবাবস্থা। বরং সেই সময়ে দাঁড়িয়ে, মেলিস যে কাহিনী হিসাবে মহাকাশ তথা চন্দ্রাভিযানের কথা ভেবে ছিলেন ও সেলুলয়েডের পর্দায় তা সফল ভাবে তুলে ধরে ছিলেন, সেই জন্য অকুণ্ঠ প্রশংসাই তাঁর প্রাপ্য।

ফিল্মটির কুশীলবদের মধ্যে কেন্দ্রীয় চরিত্র 'প্রোফেসর বার্বেনফৌল্লিস' এর চরিত্রে অভিনয় করেন স্বয়ং জর্জ মেলিস। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেন সে যুগের ফরাসী থিয়েটারের একঝাঁক অভিনেতা, যথা – ব্লিউয়েট বের্নন, ফ্রাঙ্কোইস লাল্লেমেঁ, হেনরি ডেলান্নয়, জুলস বার্জেন লেগ্রস, ভিকতর আঁদ্রে, দেল পিয়েরে প্রমুখ। ছবির সিনেমাটোগ্রাফির দায়িত্বে ছিলেন যুগ্ম ভাবে থিয়োফিলে মিচাউল্ট ও লুসিয়েন টেঙ্গাই। প্রোডাকশান ও ডিস্ট্রিবিউশানের দায়িত্বে ছিল 'স্টার ফিল্ম কোম্পানি'। সামগ্রিক ভাবে ছবিটি নির্মাণের দায়িত্বে ছিলেন মেলিস নিজেই।

'আ ট্রিপ টু দ্য মুন' এর শ্যুটিং শুরু হয় ১৯০২ খ্রীঃএ মে মাসে, শেষ হয় ওই বছরেরই আগস্ট মাসে। ছবিটির শ্যুটিং এ কোনোরূপ কার্পণ্য করেননি মেলিস। ছবির বাজেট ছিল সে যুগের নিরিখে অবিশ্বাস্য – ১০,০০০ ফ্রাঁ! ব্যবহৃত হয়েছিল সর্বোচ্চ মানের ক্যামেরা ও 'স্পেশাল এফেক্টস'। এছাড়াও মেলিস স্বউদ্ভাবিত অনেক নতুন টেকনিক ও কলাকৌশল ব্যবহার করেছিলেন ছবিটির নির্মাণে।

তারপরে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ১৯০২ খ্রীঃ এর ০১ সেপ্টেম্বরে প্রথম প্রদর্শিত হ'ল - 'লে ভয়েজ দ্যাঁস লা লুন ' (ফরাসী) বা 'আ ট্রিপ টু দ্য মুন' (ইংরেজী); সেদিন মেলিসের মালিকানাধীন 'রবার্ট-হুডিন থিয়েটার'এ ছবিটি দেখান হয়েছিল জুলস ইউজেন লেগ্রিস নামের এক ম্যাজিসিয়ানের 'ম্যাটিনি শো'এর ঠিক পরেই। দর্শকরা অবাক বিস্ময়ে দেখলেন 'জাদুকর' জর্জ মেলিসের কম বেশি ১৩ মিনিটের এই 'সিনেম্যাটিক ম্যাজিক'। তৈরি হল চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক অনন্য মুহূর্ত।

ফিল্মটি সাধারণতঃ বৃহস্পতিবার ও শনিবার 'ম্যাজিক শো' এর ফাঁকে ফাঁকে প্রদর্শিত হত 'রবার্ট-হুডিন থিয়েটার'এ। পরে দর্শকদের আগ্রহে আরও বিভিন্ন জায়গায় এর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হয়। যেহেতু 'নির্বাক' ছবি, তাই এটি যখন প্রদর্শিত হত, তখন একজন কথক থাকত দর্শকদের গল্পের ধারা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এবং সঙ্গে থাকত 'লাইভ মিউজিক'। ক্রমশঃ এই ছবির জনপ্রিয়তা এমন জায়গায় যায় যে, রীতিমত 'ফিল্ম পাইরেসি' শুরু হয়ে যায় ইওরোপ ও আমেরিকা জুড়ে!

মেলিস ১৯১২ খ্রীঃ পর্যন্ত ৫২০ টি ফিল্ম নির্মাণ করেন। তারপর বিভিন্ন কারণে তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ১৯১৭ খ্রীঃএ ফরাসী সৈন্যবাহিনী তাঁর অফিস ও স্টুডিও দখল করে নেয় এবং তাঁর বেশির ভাগ ছবির প্রিন্ট নষ্ট করে দেয়। ১৯২৩ খ্রীঃএ মেলিসের সাধের 'রবার্ট-হুডিন থিয়েটার' বন্ধ হয়ে যায় এবং সেখানে রক্ষিত ফিল্মের প্রিন্টগুলো কেজি দরে বিক্রি হয়ে যায়। অবস্থা বিপাকে মেলিস গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় পুতুল বিক্রি করতে থাকেন। এই সময়ে একদিন হতাশাজনিত ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মেলিস নিজের বাড়িতে রক্ষিত অবশিষ্ট ফিল্ম রোলগুলিকেও আগুনে পুড়িয়ে দেন। এই ভাবেই হারিয়ে যায় 'আ ট্রিপ টু দ্য মুন'। ধীরে ধীরে জনসাধারণের মন থেকে মুছে যায় 'জাদুকর' জর্জ মেলিসের নামও!

কিন্তু কোনো মহৎ সৃষ্টিই একেবারে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে না এই পৃথিবী থেকে। ১৯২৮-'২৯ খ্রীঃ নাগাদ ফরাসী চলচ্চিত্রবেত্তা ও তাত্ত্বিকরা পুনরাবিষ্কার করতে থাকেন মেলিসকে। এই সময়েই প্যারিস ও লন্ডন থেকে 'আ ট্রিপ টু দ্য মুন' এর দুটি অসম্পূর্ণ প্রিন্ট উদ্ধার হয়। এগুলোই দেখানো হতে থাকে সারা বিশ্ব জুড়ে। মানুষ আবার উদ্বেল হয়ে ওঠে। ১৯৩১ খ্রীঃএ ফরাসী সরকার জর্জ মেলিসকে 'লিজিয়ঁ দ্য'নর' পুরস্কারে ভূষিত করেন। ১৯৩৮ খ্রীঃ এর ২১ জানুয়ারী মেলিস পরলোক গমন করেন।

এর দীর্ঘকাল পরে ১৯৯৩ খ্রীঃএ আকস্মিক ভাবে এক অজ্ঞাত পরিচয় ফিল্ম সংগ্রাহকের সংগ্রহ থেকে 'আ ট্রিপ টু দ্য মুন' এর একটি সম্পূর্ণ 'হ্যান্ড কালার্ড প্রিন্ট' উদ্ধার হয়। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে এর 'রেস্টোরেশান' করে নতুন রূপ দেওয়া হয়। ২০১১ খ্রীঃএ 'কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'এ এটি প্রদর্শিতও হয়।

চলচ্চিত্রের ইতিহাসে 'আ ট্রিপ টু দ্য মুন' ফিল্মটি কেবল প্রথম কল্পবিজ্ঞান চলচ্চিত্র হিসাবেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, চলচ্চিত্র বোদ্ধা ও সমালোচকরা একেই প্রথম আখ্যানধর্মী ছবি বা 'ন্যারেটিভ ফিল্ম' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। অনেকেই আবার এই ছবিটিকে প্রথম 'পলিটিক্যাল স্যাটায়ার' হিসাবেও উল্লেখ করেছেন। এছাড়া এর অন্য বৃহত্তর তাৎপর্য্যও আছে। এই ছবিটি মুক্তি পাওয়ার ৬৭ বছর পরে, ১৯৬৯ খ্রীঃ এর ২১ জুলাই মানুষ সত্যিই চাঁদের মাটিতে পা রাখে! হয়ত এই ফিল্মের মধ্যে অজান্তেই লুকিয়ে ছিল সেই ভবিষ্যৎ সাফল্যের অনুপ্রেরণা! সর্বোপরি, 'আ ট্রিপ টু দ্য মুন' এর দেখানো পথ ধরেই, পরবর্তী কালে একে একে নির্মিত

হয়েছে – 'টুয়েন্টি থাউজেন্ড লিগস আন্ডার দ্য সি', 'ওয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ডস', 'টু থাউজেন্ড ওয়ান : এ স্পেস ওডিসি', 'সোলারিস', 'স্টার ওয়ার্স', 'স্টার ট্রেক', 'ই.টি' – র মত কালজয়ী ও ধ্রুপদী সব কল্পবিজ্ঞান চলচ্চিত্র। তাই চলচ্চিত্রের ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে 'জাদুকর' জর্জ মেলিসের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'লে ভয়েজ দ্যাঁস লা লুন ' (ফরাসী) বা 'আ ট্রিপ টু দ্য মুন' (ইংরেজী) এর নাম।

বৃত্তহীন

রাজেশ জানা
চতুর্থ সেমেস্টার, ইংরেজি বিভাগ (স্নাতকোত্তর)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

শহরে রোজ ট্রামে-বাসে ঝাঁপাচ্ছি –
চাকরি তো নয়, যেন রেসের মরনঝাঁপ!
ভীষণ রোদে ঝলসে গিয়ে যা পাচ্ছি,
বলছে শরীর : "বৃষ্টি নামুক গরম যাক!"

সামলে নিয়ে ট্রাফিক-জ্যাম ও অশান্তি,
দৌড়ে বেড়াই এদিক থেকে ও প্রান্ত...
পথিমধ্যে ধর্মঘটেও স্লোগান দিই –
কিন্তু পুলিশ যে পেটাবে কে জানত?

শার্ট ভিজে যায়, শরীর জুড়ে দুর্গন্ধ...
দু-পিস্ রুটির গায়ের জোরে গান বাঁধি,
বাবার শরীর, মায়ের গয়না যা বন্ধক..
এ সবই রোজ স্বপ্নে দেখি, সাংঘাতিক!

জুতোর তলা খুইয়ে ফেলি সপ্তাহেই,
মেরুণরঙা জামাও বুঝি যায় ছিঁড়ে...
কেউ যদি বা কাজ দিত শবদাহের
কিংবা ডিউটি সকালে বা রাত্তিরে..

উপার্জনের চিহ্ন খুঁজে কর জমাই
হেরেই ফিরি ঘরের দিকে; জিত তো নেই...
আমরা এখন জীবনবোধের তর্জমায় –
কেন্দ্রমুখী কিন্তু কোনও বৃত্ত নেই...

মহাকবি কালিদাসের সঙ্গে নাট্যকার ভবভূতির তুলনা

রাজকুমার চক্রবর্তী
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, সংস্কৃত বিভাগ
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে মহাকবি কালিদাসের পর শক্তিশালী নাট্যকাররূপে ভবভূতির খ্যাতি সুবিদিত। নাট্যকাররূপে তাই কালিদাসের সঙ্গে ভবভূতির তুলনা স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রেত। কবি হিসেবে উভয়কে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করা যেতে পারে। তবে নাট্যকাররূপে মহাকবি কালিদাসের স্থান নিঃসংশয়ে ভবভূতির উপরে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কালিদাস রচনা করেছেন তিনটি দৃশ্যকাব্য। যথা - "মালবিকাগ্নিমিত্রম্","বিক্রমোর্বশীয়ম্" এবং "অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্"। আর নাট্যকার ভবভূতিও রচনা করেছেন তিনটি দৃশ্যকাব্য। যথা - "মালতীমাধবম্","মহাবীরচরিতম্" এবং "উত্তররামচরিতম্"। "অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্" যেমন কালিদাসের শ্রেষ্ঠ রচনা "**कालिदासस्य सर्वस्वमभिज्ञान-शकुन्तलम्**, ঠিক তেমনি "উত্তররামচরিতম্" ও ভবভূতির শ্রেষ্ঠ রচনা - "**उत्तरे रामचरिते भवभूति विशिष्यते**"।

কালিদাসের "অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্" এবং ভবভূতির "উত্তররামচরিতম্" - এই দুইটি রূপক রচনার বিষয়বস্তু নির্বাচনে উভয় নাট্যকারই গতানুগতিকতার পথ অনুসরণ করে যথাক্রমে - "মহাভারত" ও "রামায়ণের" আশ্রয় নিয়েছেন। কালিদাস যেমন মহাভারতের দুষ্যন্ত-শকুন্তলার কাহিনীর কাঠামোটিতে অনেক নতুন নতুন ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশে তাকে একটি পূর্ণাঙ্গ সার্থক নাটকের রূপ দিয়েছেন, ঠিক তেমনি ভবভূতিও রামায়ণের রাম-সীতার কাহিনীতে নতুন সংযোজন এবং প্রয়োজন মত পরিবর্তন সাধন করে অতি উচ্চাঙ্গের নাটক রচনা করেছেন। নাট্যকার ভবভূতি রামায়ণের মূল কাহিনীর কিছু কিছু পরিবর্তন করে নাট্যকাহিনীতে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য আলেখ্যদর্শন, রামের সঙ্গে জনস্থান অরণ্যে বনবাসকালের প্রিয়সখী বাসন্তীর সাক্ষাৎকার, ছায়াসীতা দর্শন, লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ ইত্যাদি আকর্ষনীয় ঘটনার সংযোজন করেছেন। অপরদিকে কালিদাসও তেমনি মহাভারতের কাহিনীতে দুর্বাসার অভিশাপ, হংসপদিকার গীত, সানুমতী ও মাতলির বৃত্তান্ত, এবং অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, শার্ঙ্গরব, শারদ্বত প্রভৃতি নতুন চরিত্রের সমাবেশে উপাদেয় বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছেন।

কালিদাস এবং ভবভূতি - এই দুজন মহাকবিকেই সাধারণতঃ সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে পুরোধা নাট্যকাররূপে মর্যাদা দেওয়া হয়। উভয় কবিই উচ্চশ্রেণীর প্রতিভাসম্পন্ন মৌলিক কবি। কালিদাস তাঁর রচনায় ললিত,মধুর শব্দ এবং প্রসাদগুণে মণ্ডিতা বৈদর্ভী রীতির ফলে ভবভূতির দীর্ঘ সমাসবহুল পদ ও দুরূহ শব্দ সহৃদয় পাঠকের কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর মনে হয়। তাঁর পদ্য অপেক্ষাকৃত কৃত্রিমতাযুক্ত। ভবভূতির প্রাকৃতে ও অতিমাত্রায় কৃত্রিমতা লক্ষ্য করা যায়। তিনি প্রাকৃতেও সংস্কৃত গৌড়ীরীতির নিয়ম অনুসরণে দীর্ঘসমাসাদির প্রয়োগ করে তাকে কৃত্রিম করে তুলেছেন। অথচ কালিদাসের রচনাশৈলীর প্রধান গুণ হল - "ব্যঞ্জনা"। তিনি কখনো বাহুল্যে প্রবেশ না করে , যে ভাবটুকু প্রকাশ করতে হবে তা সামান্য দুয়েকটি কথায় ব্যক্ত করেছেন। সর্বত্রই তিনি বাহুল্যবর্জন করে আশ্চর্য পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

মহাকবি কালিদাসের কল্পনাশক্তি এবং ভাববৈচিত্র্য অসাধারণ। কিন্তু ভবভূতি এই দুইটি বিষয়ে কালিদাসের সমকক্ষ নন। আবার ভবভূতি যেমন অত্যধিক ভাবপ্রবণ ও আবেগবিহ্বল,কালিদাস কিন্তু তেমনটি নয়। কালিদাস প্রধানতঃ শৃঙ্গার রসের কবি, শৃঙ্গার রসের বর্ণনায় তিনি যেমন সিদ্ধহস্ত, ভবভূতি প্রধানতঃ করুণরসের কবি, তবে করুণ রসের কবি হলেও বীরত্বপূর্ণ এবং বিস্ময়কর ঘটনার বর্ণনায় তিনি তার মহৎসূরিকেও অতিক্রম করে গেছেন। কালিদাস প্রধানতঃ শৃঙ্গার রসের কবি হলেও করুণ রসের বর্ণনায় ও তিনি কম দক্ষ নন। অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটকের চতুর্থ অঙ্ক অর্থাত্ শকুন্তলার পতিগৃহ যাত্রার দৃশ্যটিই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সংস্কৃত আলংকারিকদের মতে শব্দের লক্ষ্যার্থ বা ব্যঙ্গার্থের মাধ্যমে কালিদাসের রচনায় "রস" অভিব্যক্ত লাভ করে, আর ভবভুতির রচনায় "রস" ব্যক্ত হয় শব্দের বাচ্যার্থের মাধ্যমে।

মানুষের আবেগ ও আদিম বৃত্তিগুলির রূপায়ণে কালিদাস সংযত। তাঁর নায়ক দুঃখে কাতর হন, কিন্তু মূর্ছিত হন না, কিংবা বাগাড়ম্বরপূর্ণ মন্তব্য করেন না। যেমন - "রঘুবংশম্" মহাকাব্যের রামচন্দ্র নির্বাসিতা সীতার মর্মন্তুদ বার্তা শ্রবণে ব্যথিত হয়েছেন। তিনি সহসা তুষারবর্ষী পৌষমাসের চন্দ্রের মত বাষ্পাকুল হয়ে উঠলেন, লোকনিন্দার ভয়ে তিনি মা জানকী সীতাকে নির্বাসন দিয়েছেন, গৃহ থেকে, মন থেকে নয়। তাই বলা হয়েছে -

"বভূব রামঃ সহসা সবাষ্পস্তুষারবর্ষীবসহস্যচন্দ্রঃ ।
কৌলীনভীতেন গৃহান্নিরস্তা ন তেন বৈদেহসুতা মনস্তঃ ॥"(১৪/৮৪)

এই একটি মাত্র শ্লোকে মহাকবি কালিদাস রামচন্দ্রের করুণ অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তিনি রামচন্দ্রের কাতরতার সবটুকু বর্ণনা করেননি, পাঠকের অনুভূতির উপর ছেড়ে দিয়েছেন। ভাবের গভীরতা যেমন অল্পকথায় অপরের হৃদয়ের অন্তস্থল স্পর্শ করে, বাগাড়ম্বরে তেমনটি করে না। অপরদিকে নাট্যকার ভবভূতির "উত্তররামচরিতম্" নাটকের রামচন্দ্র মুহুর্মুহুঃ মুর্ছিত হয়ে পড়ছেন , এমনকি কত না শোকব্যঞ্জক কথা বলছেন।

চরিত্র-চিত্রণের দিক থেকে বিচার করলে কালিদাস এবং ভবভূতি উভয়কেই সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা যায়। "অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্" নাটকে রাজা দুষ্যন্ত, মহর্ষি কণ্ব, অনসূয়া, প্রিয়ংবদা এবং শকুন্তলার চরিত্র-চিত্রণে কালিদাস যেমন নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, অপরদিকে তেমনি ভবভূতিও তাঁর "উত্তররামচরিতম্" নাটকে রামচন্দ্র, জানকী সীতা এবং লবের চরিত্র অংকনে উল্লেখযোগ্য পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন। রাজা হিসাবে রামচন্দ্রের কর্তব্যপরায়ণতা ও স্বার্থত্যাগ, মানুষ হিসাবে সীতার জন্য তাঁর "পুটপাকপ্রতীকাশ", "অন্তর্গূঢ়ঘনব্যথা" এবং অনুতাপানলের অন্তর্দাহ অত্যন্ত মনোজ্ঞভাবে বর্ণনা করেছেন ভবভূতি। "উত্তররামচরিতম্" নাটকে মা জানকী সীতার বিরহে শোকাতুর রামের আর্তনাদে পাথরও গলে যায় , বজ্রের মত কঠিন হৃদয়ও অভিভূত হয়। তাই বলা হয়েছে –
"अपि ग्रावा रोदिति अपि दलति वज्रस्य हृदयम् ।"

হৃদয়বিদারক করুণরসের কী চমৎকার বর্ণনা। তাই বলা হয়েছে –

"কারুণ্যং ভবভূতিরেব তনুতে ।"

নাট্যকৌশল প্রয়োগের দিকথেকে কালিদাসকে শ্রেষ্ঠ নাট্যশিল্পীর মর্যাদা দেওয়া হয় এবং তা সঙ্গত এবং সমীচীন। কেননা "অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্" নাটকের চতুর্থ অঙ্কে দুর্বাসার অভিশাপ, পঞ্চম অঙ্কের আদিতে হংসপদিকার সংগীত, অনসূয়া-প্রিয়ংবদা বিরহিতা শকুন্তলাকে রাজপ্রাসাদে প্রেরণ, রাজা দুষ্যন্ত কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলাকে পুনরায় কণ্বাশ্রমে ফিরিয়ে না আনা ইত্যাদি ঘটনা অবতারণার মাধ্যমে মহাকবিকালিদাস অদ্ভুত নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। অপরদিকে নাট্যকার ভবভূতির নাট্যকৌশলও অনেকের কাছে প্রশংসনীয়। "উত্তররামচরিতম্" নাটকের প্রথমাঙ্কে আলেখ্যদর্শনে সীতার অরণ্যদর্শনের সংকল্প অতি স্বাভাবিকভাবেই রামচন্দ্র কর্তৃক মা জানকী সীতা বিসর্জনের মাধ্যমে সীতার অরণ্যবাসের সুযোগ ঘটিয়ে দিল। তৃতীয়াঙ্কে ছায়াময়ী সীতা রামচন্দ্রের শোকের গভীরতা ও আন্তরিকতা অনুভব করলেন, ভবিষ্যতে রামের সঙ্গে তাঁর মিলনের পথ সুগম হল।

কোনো কোনো বিদ্বজনেরা মনে করেন ভবভূতির নাট্যকৃতিতে নাট্যকৌশলের চেয়ে কবিত্বশক্তি অধিকতর প্রশংসনীয়। কথাটি একেবারে অর্থহীন নয়। তাঁর রূপকের অনেকস্থলে কবিত্বের উজ্জ্বল নিদর্শন দেখা যায়। কোনো ভাবাবেগের বর্ণনায় বিশেষতঃ করুণ রসের এবং অনেক ক্ষেত্রে শৃঙ্গার আশ্রিত ভাবের প্রকাশে, যেমন - "উত্তররামচরিতম্" নাটকে ছায়াসীতার দৃশ্যে পূর্বস্মৃতির উদয়ে রামচন্দ্র ও মা জানকী সীতার মনোভাবের কবিত্বময় প্রকাশ ঘটেছে। অন্যদিকে কালিদাসের ক্ষেত্রেও একথা মিথ্যা নয় যে তাঁর দৃশ্যকাব্যের কোথাও কোথাও নাট্যগুণের চেয়ে কাব্যগুণ একটু বেশী প্রকাশ পেয়েছে। যেমন - "অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্" নাটকের চতুর্থ অঙ্কে। তবে তা নাট্যকার ভবভূতির মত নয়। প্রভূত নাটকীয়তা থাকা সত্ত্বেও নাট্যকার ভবভূতির "উত্তররামচরিতম্" নাটকটি গীতিকাব্যের সুরমূর্চ্ছনায় প্রতিধ্বনিত, মধুর করুণরসের গীতিমাধুর্যে অভিষিক্ত। তাইতো সমালোচকের দৃষ্টিতে ভবভূতি যতবড় নাট্যকার, তার চেয়ে বড় কবি। ভাবপ্রবণতা কবির পক্ষে গুণ বটে, নাট্যকারের পক্ষে নয়। কাব্যগুণে সমৃদ্ধ হওয়ায় ভবভূতির নাটকের গতি অনেকস্থলে ব্যাহত হয়েছে।

বর্ণনায় মাত্রাবোধের দিক থেকে ভবভূতি কালিদাসের চেয়ে হেয়। অনেক ক্ষেত্রে তিনি মাত্রাবোধ হারিয়ে অসংযমের পরিচয় দিয়েছেন। এইটি ভবভূতির রচনার একটি প্রধান ত্রুটি। তবে মহাকবি কালিদাস নিঃসন্দেহে এই ত্রুটি থেকে মুক্ত। বর্ণনায় তাঁর পরিমিতিবোধ খুবই প্রশংসনীয়। নাট্যকার ভবভূতি তাঁর বিষয়বস্তুকে কেবল বিশদভাবে বর্ণনা করেন না, অনেক স্থলে তাঁর বর্ণনা মাত্রা অতিক্রম করে। অপরপক্ষে কিন্তু মহাকবি কালিদাস কেবল দু-চার কথায় আভাস দেন। ভবভূতির "মালতীমাধবম্" প্রকরণে নায়ক মাধবের শোকোচ্ছ্বাস ও বিলাপ ইত্যাদির অবতারণা গ্রন্থখানাকে অনাবশ্যক ও অবাঞ্ছিতরূপে দীর্ঘায়িত করেছে। "উত্তররামচরিতম্" নাটকে রামচন্দ্রের চরিত্রে ও এ ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। তাঁর নায়ক প্রায়ই মূর্ছিত হন, সংজ্ঞালাভ করেন, পুনরায় মূর্ছিত হন। এতে ধীরোদাত্ত নায়কের পৌরুষ অক্ষুন্ন থাকে না। নাট্যকার ভবভূতি অনেক বলতে পারেন। কিন্তু মহাকবি কালিদাস না বলেই বলার কাজ সেরে নেন।

ভবভূতির সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি এই যে, তিনি পাঠককে কখনো লঘু হাস্যরসের বৈচিত্র্যের আস্বাদ দেননি। মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থে জীবনের সহজ-স্বচ্ছন্দগতি, আমোদ-আহ্লাদ প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু নাট্যকার ভবভূতির রচনায় কেবল জীবনের দুঃখ দৈন্য, হতাশা-বিষাদ দিকে দিকে ফুটে উঠেছে। কালিদাসের রচনায় রুচিসম্মত এবং উপভোগ্য হাস্য রস পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু নাট্যকার ভবভূতির রচনাসমূহে হাস্যরস নেই বললেই হয়। কঠোর কর্তব্যপরায়ণতা, মহান দাম্পত্যপ্রেম প্রভৃতির সার্থক রূপ দিতে গিয়ে তিনি জীবনের হাস্যরসিকতাময় লঘু অথচ বাস্তব দিকটিকে উপেক্ষা করেছেন।

প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনায় ভবভূতি সিদ্ধ হস্ত। মহাকবি কালিদাসের প্রকৃতি বর্ণনার মাধুর্য বা লালিত্য হয়তো ভবভূতির প্রকৃতি বর্ণনায় নেই, কিন্তু প্রকৃতির বাস্তবরূপটি এমন করে আমাদের সম্মুখে কালিদাসও অনেকস্থলে তুলে ধরতে পারেননি। কালিদাস কেবল প্রকৃতির মধুর ও কমনীয় রূপটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অপরদিকে ভবভূতির রচনায় প্রকৃতির রুক্ষ, কর্কশ এবং ভয়ঙ্কর রূপটিও ধরা পড়েছে। ভবভূতির প্রকৃতির ভীষণ ও ভীতিজনক রূপের বর্ণনায় ভাবের সঙ্গে ভাষার অপূর্ব সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। যেমন- দণ্ডকারণ্যের বর্ণনায় বলা হয়েছে -

“कण्डूलद्विपगण्डपिण्डकषणोत्कम्पेन सम्पातिभिः
घर्मस्रंसितवन्धनैः स्वकुसुमैरर्चन्ति गोदावरीम
छायापस्किरमाणविष्किरमुखव्याकृष्टकीटत्वचः
कुजत्कान्तकपोतकुक्कुटकुलाः कुले कुलायद्रुमाः ॥”(उत्तररामचरितम्/२/९)

নাট্যকার ভবভূতির উক্ত প্রকৃতি বর্ণনার সঙ্গে মহাকবি কালিদাসের প্রকৃতিবর্ণনার তুলনামূলক বিচার করলে উভয়ের প্রকৃতিবর্ণনার মধ্যে পার্থক্য সহজেই সহৃদয় পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবং সর্বোপরি উভয় কবির তুলনামূলক বিচারে বেশকিছু কবিত্বের পার্থক্য অনায়াসেই সকলের দৃষ্টিগোচরে আসে।

ভবঘুরে

পুষ্পেন্দু মন্ডল
চতুর্থ সেমেস্টার, ইংরেজি বিভাগ (স্নাতকোত্তর)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

আবার যখন ফিরবে রাখালের দল গোধূলি পথে,
কোকিল কৃষ্ণ ঠোঁটে বাঁশির সুর তুলবে।
ব্যস্ত সকল রাস্তাঘাট, ধোঁয়াশায় ঢেকে যায়,
গোলমেলে পৃথিবীর আনাগোনা আমাকে আরও প্রলুব্ধ করে।
বাতাসের মাদকতায় আমার দেহে
দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে ভবঘুরের দস্তক।
ইচ্ছেরা বন্ধদ্বারে আবদ্ধ থাকতে চায় না।
মুঠোভরা বৃষ্টির সুখ,
ঘুমহীন ফুলের গন্ধে আবার জন্ম নেয়।
ঝিঁঝিঁ পোকার মাতাল রব,
জোনাকিদের তেপান্তর,
আমার চোখে আটকে যায় মরীচিকা।
ভেবে ভেবে অলসতা গুলোর কাছে
অবসর চাইব কোন একদিন।
এখন ছন্দ ছাড়িয়ে ছন্দহীনে উড়নচন্ডী।

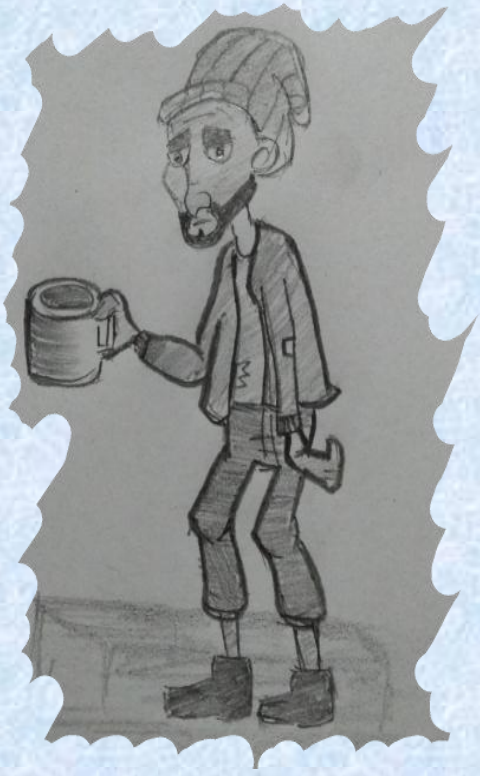

ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি, রোজ প্রতিশ্রুতি দেয়,
"কখনো সে মরবে না।"
মেঘের নীল শিরায়
প্রেমের উপঢৌকন প্রতিরাতে জ্বালিয়ে রাখে সান্ধ্যবাতি।
হৃদয়ের গিরিখাতে, অসাড় হতে থাকে অপেক্ষাগুলো।
কখন নেমেছে রোদের মেলা, আমার নরম শরীরে
মিথ্যা দুঃস্বপ্নে।
একটুকরো হাসি বেঁচে থাক দু-ঠোঁটে, স্বপ্নভেজা আঙ্গিনাতে।
আবেগটুকু প্রত্যাশীর মতো প্রানবন্ত হয়ে থাকুক আমার দুচোখে।
আমি ভবঘুরে, একলা চাঁদের আলোয় গল্প খুঁজি।

করোনা বনাম রাজনীতি

রামপদ সাউ
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

বিগত প্রায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে নাটকীয় ঘটনা প্রবাহকে পিছনে ফেলে করোনা ভাইরাস বিশ্বজনীন মহামারীতে পরিণত হয়েছে। এবার বন্ধ হোক করোনাকে নিয়ে রাজনীতির টালবাহানা। এই মহামারীর মধ্যে যদি রাজনীতির গোলযোগ মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে চলে তবে হয়তো ভবিষ্যতের সকালটি কারোর পক্ষে সুখময় হয়ে উঠবে না। রাজনীতি যদি রাজার নীতি হয় তবে সেই রাজাকে হতে হয় প্রজা হিতৈসী রাজা। আর আজকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের রাজনীতিতে দেখা যায় এক আলাদা ধরনের রাজনীতি, যেখানে রয়েছে একে অপরের কাজকে পরাস্ত করার প্রবণতা। যার প্রভাব পড়েছে আপামর জনসাধারনের মধ্যে। যার প্রভাব পড়েছে এই মহামারীর মধ্যেও।

এই মহামারী বিশ্বব্যপী প্রতিটি দেশের নিজ নিজ জনপ্রশাসন এবং সেসব দেশের কমী জিনারা আন্তজার্তিক সংস্থাসমূহের জন্য অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থায় বড় চাপও তৈরি করেছে।

বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার পরবর্তী ফলাফল আনুমান করা এখনও দুরের ব্যপার। তবুও কিছু প্রাথমিক হিসাব নিকাশ এখনই করা যায়। খারাপ হলেও একথা সত্য যে সেসব হিসেব অতিব হতাশা জনক।

আজ একটি বিষয় স্পষ্ট যে অনেক অনেক মানুষের জীবন জীবিকা বিভাজিত হয়ে যাবে 'আগে' এবং 'পরে ' এই দুই ভাগে। কাউকে কাউকে হয়তো তাদের ভ্রমণের অভ্যস ছাড়তে হবে, কাউকে কাউকে পুরনো পেশায় ফিরে যেতে হবে অথবা পতনের ঝুঁকি দ্বারা তাড়িত হতে হবে।

এখন যখন মানবতা একটি বিশ্ব জুড়ে মহামারী অতিক্রম করছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি রাজনীতিবিদরা আন্তজার্তিক বিষয়গুলিতে নিজ নিজ অবস্থা পরিবর্তন করার ব্যপারে স্থির হয়ে আছে। করোনা ভাইরাসের এই বিস্তার না পেরেছে সিরিয়া পরিস্থিতির তীব্রতা ঠেকাতে, না পেরেছে লিবিয়ার যুদ্ধ বিরতি চুক্তির ফাটল ধরাতে। ইরান এই মহামারীর একটি অত্যন্ত প্রধান কেন্দ্র হওয়ার ফলেও ওয়াশিনটন তেহেরানের প্রতি তার বানিজ্য নিষেধাজ্ঞা শিথিল করতে মোটেও তাড়িত হয় নি। এই সকল বিষয়ে এবং আরও অনেক বিষয়ে মানবগোষ্ঠী আত্মসংরক্ষণের বৈশ্বক স্বার্থকে পিছনে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে রাজনীতি, অর্থনীতি এবং অপরাপর গোষ্ঠী স্বাস্থ্য-এর সুযোগ সুবিধার জন্য।

সবকিছুর উপরে, এই মহামারি শুরুর এক বছর পরেও আমাদের অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে বিশ্ব এখনও প্রতিদিনই ক্ষনস্থায়ী বিরোধ ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র আত্অহংকার, কৌশলগত অর্জন এবং ক্ষয় ক্ষতি নিয়ে ঝগড়া ফ্যাসাদ করে যাচ্ছে।

যাই হোক, আমদের পুরো বিষয়টির জন্য বিবেকহীন রজনীতিবিদ, অতিলোভি প্রতিরক্ষা কর্পোরেশন এবং দায়িত্বহীন অর্থ জালিয়াতদের দায়ি করা হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কারণ সমাজটা আমদের সকলের। তাই সবাইকে চলমান মহামারীর অহরহ মানব চরিত্রের সাথে সব দিক বিচার বিবেচনা করে এই মহামারীর প্রতিরোধ করতে হবে।

সাধারণ চ্যালেঞ্জের মুখে মানুষের সমন্বিত প্রয়াস - হোক সেটা বিশ্বজনীন মহামারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা মানবসৃষ্ট দুর্যোগ - সাধারণভাবে নিম্নগামী। জাতীয়তাবাদের নিয়মাবদ্ধ চর্চা এবং জাতীয়তার স্বাতন্ত্র্য, অভ্যন্তরীণ অথবা বাহ্যিক বিদেশাতঙ্ক বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করার দাম্ভিকতা, কৌশলগত স্বার্থের চেয়ে যুদ্ধকৌশলগত স্বার্থকে প্রাধান্য প্রদান-এসবই বিশ্ব রাজনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ, যা আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি যে, পরিণতির ভেতর দিয়ে ছাড়া তা অগ্রসর হয় না।

পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশের সমাজ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে, সেগুলোকে আর কেউ যেকোন মহামারি এবং সংকট মোকাবেলার জন্য ভরসা করার মতো বলে দেখছে না। এমনকি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নেও করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, তা স্ব স্ব দেশের রাজধানীতে, ব্রাসেলসে নয়। কিন্তু সমাজ নিজ নিজ সরকারের ওপরও আস্থা পোষণ করছে না। কারণ, তারা মনে করছে, সরকার তাদের কাছে সত্য গোপন করছে এবং এই মহামারীকে হীন রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। তাদের দিক থেকে সরকারগুলো একে অপরকে বিশ্বাস করছে না এবং তা শুধুমাত্র সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের ক্ষেত্রেই নয়, সহযোগী ও অংশীদারদের ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়েছে। ফলে, অবিশ্বাসের একটি দুষ্টচক্র ক্রিয়াশীল রয়েছে যা যে কোনো মহামারীর জন্য আদর্শ এক পরিবেশ।

এটি মনে হচ্ছে যে, জনগণের দিক থেকে চরম চাপ প্রয়োগ ছাড়া সরকারসমূহ নিজেরা এমন কোন উদ্যোগ গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করবে না। কারণ, তারা এখনও করোনা ভাইরাসকে 'আপদ'মনে করছে না, বরং এটিকে বিশ্ব রাজনীতির একটি বিশিষ্ট বিষয় মনে করছে। এ ধরনের একটি মনোভাব মানব জাতিকে অধঃপতনের দিকে ঠেলে দেবে এবং চূড়ান্তভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। এটি শুধু বিমূর্ত 'তাদেরকেই'মানে সরকার বা কর্পোরেশনকেই অন্তর্ভুক্ত করে না, বরং সুনির্দিষ্টভাবে বললে 'আমাদেরকে'ও। আজ যদি না-ও হয়, এটি দশ কিংবা পঞ্চাশ বছরে ঘটবেই। যদি করোনা ভাইরাস থেকে না-ও হয়, এটি হবে জলবায়ু পরিবর্তন অথবা বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক যুদ্ধের কারণে। নিজেদের রক্ষা করার তাগিদে, যা সকল প্রাণীকুলে সহজাতভাবে বিদ্যমান, চূড়ান্তভাবে জাগিয়ে তোলার জন্য মানবজাতির আর কোন্ সংকেত দরকার?

করোনা'র প্রতি কবি

শোভন ঘোষ
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

"কাল প্রসন্ন, সুপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও। তাহাতে নাম লেখ, 'শ্রীমধুসূদন' ।" ------বঙ্কিমচন্দ্র।

মহাকবি শ্রী মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মরণে, নিকটে-দূরে সকল 'বঙ্গভাষী' -কে পরম শুভেচ্ছাবার্তা রূপে।

ধরিলা করোনা রাজা, অশ্বমেধ-হয়ে
মানবের। জয়-পত্র দেখি ভালে তার,
ব্যঙ্গে, হাসিলা নীরবে; হাসেন যেমতি,
বজ্রগর্ভ - ক্ষণপ্রভা, ঘন - অন্তরালে।
কিন্তু যবে, বরিষণ করে বজ্রে তার,
সকলে পশে রে গৃহে; তেমতি করোনা
রাজা,ঘোষিলে আহব; লুকাইল সবে।
ডাকাতের দল দেখি, গভীর নিশীথে,
গৃহস্থ যেমতি দ্রুত, বন্ধ করে দ্বার;
তেমতি, শত্রুরা ছেয়ে গেলে চারিদিকে;
কারাবন্দী যেন কেহ, করিল মানবে।
বিদ্যুৎগতি অশ্বে, যেন আনিলা বাঁধিয়া,
প্রভু তার মন্দুরায়; মুক্তক্ষেত্র হতে।
কিংবা বনভূমে বুঝি, কুরঙ্গী পড়িল
বাঁধা, নিষাদের জালে। হস্তপদ বাঁধি,
শিকারে তাহার, ফেলি গেলা ব্যাধ কি রে;
বনভূমে ! রুদ্ধশ্বাস হল প্রাণ তার ।
মনোরথ-গতি জীব, মানব তেমতি ;
থামিল নিমেষে। যেন গ্রাসিল মেদিনী,
কর্ণের রথে,শোধিতে অভিশাপ তার।
বন্ধ হল স্থলে যান,জলেতে জাহাজ,
অবতরণ করিল বৈমানিক, উর্ধ্ব
হতে। চঞ্চল কালের গতি,যেন ওরে,
সহসা থামিল বুঝি,অদৃশ্য ইঙ্গিতে।
সাজাইলা রাজা তার,সৈন্য বহুবিধ;
জলে-স্থলে-অন্তঃরীক্ষে, অতীব সত্বরে;
কে পারে গনিতে তারে,কত লক্ষ-কোটি!
শব্দহীন রনবাদ্য, বাজাল দাম্ভিক;
সমগ্র মানব ভয়ে, প্রমাদ গনিল।

মানবের পক্ষ হতে, দাঁড়াইলা রণে,
পুরোভাগে; ঈশ্বরের পরে উচ্চারিত
নাম যাঁর, জানে সবে, সেই চিকিৎসক।
চিত্রগুপ্তে লয়ে যবে, মুমূর্ষুর দ্বারে,
সমাগত যম-রাজ; ফিরায় রে দোঁহে,
এই বুদ্ধিমান প্রাণ; তা আর কারোর
পক্ষে, কভু না সম্ভবে।বড়ো,ভালোবাসি
শ্রদ্ধা করি, আমি এই বুদ্ধিমান জীবে।
আইলা ছুটিয়া রণে, সেবিকারা দ্রুত;
রামচন্দ্র পার্শ্বে মিত্র, বিভীষণ যেন।
আর শত স্বাস্থ্যকর্মী, আইল ধাইয়া;
লাগিলে আগুন গেহে,আসেন যেমতি
সবে, নিভাতে পাবকে; নানাবিধ লয়ে।
বাহিরিয়া শত শত,আইলা রক্ষক;
নিবারিতে মূঢ়জনে,ঘনজন হতে।
নগরপাল আইল ছুটিয়া, রোধিতে
নগরজনে; প্রচারি সন্দেশ তাহার।
যষ্ঠি চালাইল কেহ,কেহ দেখাইল
ভয়, ধরিয়া বন্ধুক।কেহ বা সদাই
সবে ধমকি-চমকি, গরজিল রোষে;
ঘন মেঘ গরজায়, যেমতি রে সদা;
পুনঃ, বরিষার কালে। আবার কেহ বা,
জোড়-হস্ত করি সবে,ক্রন্দিল নীরবে
চেষ্টা করি বার বার, ব্যর্থ হয়ে যবে
দুঃখে, কাঁদে ব্যথাতুর; তেমতি রোদিল
রে সে, জনস্রোত মাঝে, হইয়া বিফল।
আরো কত গুণীজন, দাঁড়াইলা এসে,
রণভূমে জোগাইতে,অস্ত্রের সম্ভার;
রণকুশলীরে,- করি প্রাণপন সবে।
যেমতি পরমাত্মীয়, আসে রে ছুটিয়া;
দেখিলে বিপদ কভু,রক্ষিতে আত্মীয়ে।

যুযুধান দুই পক্ষ,করোনা-মানব;
দাঁড়াইলা রণে। হল স্তব্ধবাক্ ধরা;
প্রলয়ের পূর্ব-কালে, মৌন যেন মহী।
কিন্তু লয়ে ভিন্দিপাল,কে কবে নিবারে
রে, সমরে তিরন্দাজে? চালাইলা অরি,

অতি খর বাণ তার, ক্ষিপ্রতম বেগে;
হায়! কব তা কাহারে, মরিল মানব
কত। ইন্দ্রজিৎ যেন, তিরস্করণীর
বেশে, লক্ষশর যুঝি, ইন্দ্রে নিক্ষেপিলা।
কাঁদিয়া উঠিল ধরা, মুহুর্মুহুঃ, হু-হু
হা-হা রবে। মাতা বুঝি, উঠিলা কাঁদিয়া;
সন্তানেরে কোলে লয়ে, দেখিয়া বিপদ।
সারঙ্গ-জননী যেন, লইয়া শাবকে;
সসম্মুখে ব্যাঘ্ররাজে, দেখি চমকিলা।
কিন্তু কৃতান্তের হিয়া, অনুভবে কবে;
জননী-হৃদয় কথা ? বিলাপিলা মাতা,
প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রে, হারাইয়া রণে।
যেন প্রাণ,ছাড়ি গেলা দেহে – জলতল
হতে বুঝি, মাতৃ-মৎসে তুলিলা ধীবর;
যন্ত্রনায় আর্তনাদী, আঁধার দেখিলা।
প্রিয়া-হৃদি বিদরিল, প্রিয়তম শোকে;
বিঁধিলা নিষাদ যবে- ক্রৌঞ্চবাকে, তীরে
তমসার, বিলাপিলা যেন ক্রৌঞ্চবাকী।
পুত্র হারাইল, মাতা। ভ্রাতা ভগিনীরে।
পিতা আধবোল শিশু, শিশু জনকেরে।
আর কতজন সদা,রোদনিল দুখে;
হারাইয়া প্রিয়জনে, এ পৃথিবী হতে।
শোকাবেশে, বিবশার মতো, ভূমিতলে
পড়িল কেহ, নিবারি অশ্রুধারা; হায়!
গভীর নিদাঘে শুষ্ক, স্রোতস্বিনী যথা।
আর কবি হিয়া হতে,বহিয়া রুধির;
পড়িল লেখনী মুখে,অক্ষর প্রকাশি।

ধরিয়া করোনা-রূপ, কাল বুঝি আজি,
প্রবেশিলা মানবের ঘরে। অমানিশা,
ঘনঘোর ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ যবে, ভাগ্যাকাশে
মানবের; নিভে গেছে চাঁদ-তারাদলে।
মিহিরে গ্রাসিছে রাহু, জোনাকিরা ভুলে
গেছে, জ্বালাইতে আলো; পশিল নীরবে,
কাকোদর ! পক্ষীনীড়ে, হয়ে সর্বগ্রাসী।
বৃথায় মানব জন্ম, এ সংসার এবে;
দুঃখের সাগরে সদা, নিমজ্জিত ধরা।
ভাসিছে কাল-সমুদ্রে আজি, ঊর্মিঘাত

লয়ে, কত যে তরণী; কহিব কাহারে?
উঠে রব, এই বুঝি গেল জলতলে।
হাবুডুবু, সন্তরণে- বাঁচিছে জীবন!
কত যে সাধনা তার, বুঝিবি কি তুই।
বিন্দু বিন্দু জমে জল, হয় রে সিন্ধুর
ধারা। মানব-সিন্ধুর খাতে, বহিতেছে
যে বারি আজি,জানিস! কত শত-কোটি
বর্ষ, আরাধনা তার, এ ভুবন মাঝে।
মধুচোর ভাবে কি'রে কভু, মধুকর
কথা; কত না ভ্রমিয়া সে, তপ্ত নিদাঘে;
প্রতিফুল হতে করে, আহরণ তারে?
তেমতি, আজিকে এই বিপদের কালে;
হরিলি রে মধু তুই, মধুচোর রাজা;
মানব-কানন হতে। কুঁড়িতে কুসুম -
অকালে পড়িল ফল; কিশলয় সহ।
মধুর কাননে তার, বেড়িলি রে তুই
আজি; দাবানল লয়ে। পোড়ে মহীরুহ,
বনস্পতি, শিশুদল মাঝে অসহায়।

মহিষাসুরের বেশে বাহিরিল, শত্রু
সৈন্য, নানারূপ ধরি; দুর্বার-দুর্জয়।
একাকিনী পার্বতীরে, বেড়িল ঘিরিয়া।
কিন্তু জানে সর্বজনে, ধরণীর পরে;
ভীম-ভীমানলে গর্জি, সমর ভৈরবে;
মহিষাসুরমর্দিনী বিজয়িনী সদা।
ইতিহাস বুকে লয়ে, বাঁচিছে সকলে;
আঁধার ঢেকেছে কবে,আলোকের রেখা?
ছত্রভঙ্গ হলে রণে, মানব-মানবী ;
দেখিয়া বিজ্ঞানাগারে, পশিল বিজ্ঞানী;
সাধনায় বিশ্বভূমে। ব্রহ্মার আদেশে,
সৃজনিতে তিলোত্তমা; বিশ্বকর্মা যেন,
আপন সাধনে মগ্ন; হইলা একাকী।
বিশ্ববিদ্যালয়-ধামে, কিরীট সদৃশ
অক্সফোর্ড, সৃজনিছে, যে মহৌষধ আজি,
রক্ষিতে মানবে; নাহি জানি ওরে, হবে
কি সে? বিশল্যকরণী! প্রাণদায়ী সবে।
যদি হয় হোক তবে, গাহিবে ভুবন,

জয়গাথা তার; সদা, শিরোপরি লয়ে।
বহুদিন, বৃষ্টিহীন হলে বসুন্ধরা,
ঘনায় অম্বর যবে; চাতক যেমতি,
উৎসুক ব্যাগ্রতা লয়ে, চাহে তার পানে;
তেমতি আজিকে ভবে, চাহিছে সকলে,
তার পানে সদা;- বুঝি বুভুক্ষু ভিক্ষুক,
দাঁড়ায়েছে রাজ-দ্বারে, আশা লয়ে বুকে।

করোনা রে- কত ক্ষরা, কত মহামারী,
কত প্রলয় দেখেছে ধরা। আসিয়াছে,
মহাপ্রলয় গ্রাসিতে সকলে; করাল
মূর্তি লয়ে।তখনো তো, বাঁচে প্রাণ কত!
পর্বত-কন্দরে, উচ্চ-ভূমিভাগে, গুপ্ত
মৃত্তিকা গভীরে, সুপ্ত সাগরের মাঝে।
সর্বদা ঘোষিত জয়, তার, ত্রিভুবন
মাঝে। এমনি প্রাণের মহিমা সবার।
কি দেখিয়া, তবে তুই, দেখাস্ সকলে
ভয়; মূঢ়? বৃষ্টিধারা যবে, বজ্রপাত
সহ, বিধ্বংসী ঝঞ্ঝারে লয়ে; আছাড়িয়া
পড়ে বৃক্ষোপরি। যথা বিহগা কুলায়,
শাবকেরে লয়ে জাগে, পক্ষপুটে ঢাকি;
থাকিতে মায়ের প্রাণ, না স্পর্শিতে পারে
কেহ শাবকে তাহার; ফিরে আসে তারা
সবে, পরাভব মানি। কি দেখিয়া তবে
তুই, পাইলি সাহস? লইবি কাড়িয়া,
মাতৃ-অঞ্চল হইতে; সন্তানে সবার।
ওরে পামর, মারিবি একে একে তুই!
আর দাঁড়ায়ে দেখিবে, জগৎবাসী সবে?
ধৈর্য ধর ক্ষণকাল - তিরন্দাজে সাজি,
যবে সে আসিবে, তোর কাছে; আক্রমিবে
তোরে, কেশরীর মতো; পলাইবি তবে
তুই, শৃগাল-কুক্কুর সম, মহাভয়ে
দূরে। কবির মনীষা, ব্যর্থ হয় যদি;
তবে, এ জগতে, আর কিছু সত্য নাহি।
শোন্ ওই কলরোল, দূর সাগরের
পারে, রাশিয়ায়; যেথা ভল্গার কিনারে-
মিলিছে নগরবাসী; সাজিছে সকলে,

তোর মৃত্যুবাণে লয়ে। এলাব্রাস শিরে,
ভাতিছে, শশাঙ্ক-জ্যোতি, কাল-মেঘে ভেদি;
বিনাশিতে বিভাবরী, জগতের মাঝে।
মুছিতে কলঙ্করেখা, জন্মভূমি ভালে,
দূর রণক্ষেত্রে, - রাজ পরাক্রমে অরি,
ধরাশায়ী হলে। কিংবা গ্রাসিছে শত্রুরে,
অগ্রগামী সৈন্যদল, জলধি-গর্জনে;
পাইয়া সংবাদ যবে, সাজে মহোৎসবে;
রাষ্ট্রবাসী তার, সদা। তেমতি আজিকে,
সাজিছে, অবনী-শ্রেষ্ঠ; আনন্দ উৎসবে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত এই কবিতায় - কিছু শব্দের দুর্বোধ্যতার কারণে, কয়েকটি জটিল শব্দের অর্থ নিম্নে দেওয়া হল।যারা জানেন তারা এটাকে অতিরিক্ত বা অনাবশ্যক রূপে পরিহার করবেন ---------

অশ্বমেধ হয়ে - অশ্বমেধ ঘোড়াকে, বজ্রগর্ভ-ক্ষণপ্রভা - বজ্রযুক্ত বিদ্যুৎ, ঘন-অন্তরালে - মেঘের আড়ালে, বরিষণ - বর্ষণ, ঘোষিলে - ঘোষণা করলে, আহব - যুদ্ধ, মন্দুরায় - ঘোড়ার আস্তাবল, কুরঙ্গী - হরিণী, নিষাদ - ব্যাধ, মনোরথ-গতি - দ্রুততায়,মনের মতো গতিবিশিষ্ট রথ। মেদিনী - পৃথিবী, বৈমানিক - বিমান চালক, পুরোভাগে - সবার আগে বা সামনে, গেহে - গৃহে, পাবক - আগুন, রক্ষক - রক্ষাকারী অর্থাৎ পুলিশ, মূঢ়জনে - বোকা লোককে, ঘনজন - জনঘনত্বপূর্ণ, নগরপাল - নগরের পুলিশ, সন্দেশ - বার্তা বা খবর, যষ্ঠি - লাঠি, গরজিল - গর্জন করল, বরিষা - বর্ষা, ক্রন্দিল,রোদনিল,বিলাপিল - কান্না,
যুযুধান - বিবাদমান অর্থাৎ যুদ্ধ করতে প্রস্তুত, ভিন্দিপাল - বল্লাম বা ত্রিশূল জাতীয় অস্ত্র,তিরন্দাজ - ধনুকধারী,তিরস্করণী - অদৃশ্য হওয়ার বিদ্যা,সারঙ্গ - হরিণ,কৃতান্ত - যম,ক্রৌঞ্চবাক্ -একজাতীয় পাখি অর্থাৎ বক,নিদাঘ-গ্রীষ্ম, স্রোতস্বিনী - নদী, রুধির - রক্ত, মিহির - সূর্য, কাকোদর -বিষধর সাপ,ঊর্মিঘাত - ঢেউয়ের আঘাত, তরণী - নৌকো, সন্তরণ-সাঁতার,বিশ্বভূমে - বিশ্বের সর্বত্র, তিলোত্তমা - পৌরাণিক প্রসঙ্গ আছে। সংক্ষেপে, সুন্দ-উপসুন্দ নামক দুই রাক্ষসভ্রাতাকে হত্যা করতে বিশ্বকর্মা এ বিশ্বের সবকিছু থেকে তিল তিল সৌন্দর্য আহরণ করে অবর্ণনীয়া সুন্দরী তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করেন।যার ফলে কামোন্মত্ত দুই ভ্রাতা,পারস্পরিক যুদ্ধে নিহত হয় এবং দেবলোক দানবমুক্ত হয়।
কিরীট - মুকুট, সৃজনিছে- সৃষ্টি করছে, শিরোপরি - মাথার ওপরে, অম্বর - আকাশ,করাল - ভয়ানক দন্তবিশিষ্ট, বৃক্ষোপরি - বৃক্ষের ওপরে,বিহগা - পাখি,কুলায় - বাসায়,কেশরী - সিংহ, ভল্লা - রাশিয়ার নদী, এলব্রাস/এলাব্রাস - রাশিয়ার সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ, শশাঙ্ক-জ্যোতি - চাঁদের কিরণ, বিভাবরী - রাত্রি, জলধি - গর্জনে - সমুদ্র গর্জনে, অবনী শ্রেষ্ঠ - পৃথিবী শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মানুষ।

শেখর দেবরায়ের ভাষা আন্দোলনের নাটক

ড. পীযূষ কান্তি ভট্টাচার্য
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

এক সময় বৃহৎ কাছাড় জেলা ছিল বর্মণ রাজাদের দ্বারা শাসিত। ১৮৩২ সালে ব্রিটিশ শাসক লর্ড বেন্টিঙ্কের শাসনামলে শেষ বর্মণ রাজা অপুত্রক গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নী ইন্দুপ্রভার হাত থেকে ইংরেজরা কাছাড়ের শাসনভার গ্রহণ করে। ইংরেজ শাসিত এই কাছাড় জেলা তৎকালে বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর পূর্বে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে ব্রিটিশ শাসনামলে ১৮৭৪ সালে বাংলার বৃহৎ জেলা শ্রীহট্টকে অসমের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। বঙ্গদেশের বাঙালি অধ্যুষিত তিন জেলা শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া অসমের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি আলাদা রাষ্ট্র গঠনে ব্রিটিশ রাজশক্তি এবং কংগ্রেস ও মুসলিমলীগ ঐকমত্য পোষণ করে। সে সিদ্ধান্ত মোতাবেক সিলেট ভারত না পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হবে তা নির্ধারণের জন্য ১৯৪৭ সালে ৭ জুলাই বৃহত্তর সিলেটে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। ৫৫,৫৭৮ ভোটের ব্যবধানে সিলেট পাকিস্তানে থাকার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে সিলেটের করিমগঞ্জ মহকুমার তিনটি থানা ভারতের আসাম রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। সে সময় অসমে বাঙালিরাই ছিল সংখ্যা গরিষ্ঠ। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে বাঙালিরা সংখ্যায় কমতে শুরু করে।

আদমশুমারি অনুযায়ী অসমের ভাষাভিত্তিক জনসংখ্যা হলো :
১৯৩১ সালের আদমশুমারি
বাঙালি ৩৯,৫৪,০৩৫ জন
অসমিয়া ১৯,৮৫,৫১৫ জন
পাহাড়ী জনজাতি ১২,৫৩,৬১৩ জন
বিভিন্ন ভাষাভাষী ৭,৫৬,১৫০ জন

১৯৫৬ সালের আদমশুমারি
অসমিয়া ৫৯,৬৫,১৫৯ জন
বাঙালি ১৭,১৯,১৫৫ জন
পাহাড়ী জনজাতি ৭,৫৬,১৫০ জন
অন্যান্য ভাষাভাষীর সংখ্যা উল্লেখ নেই
জাতিগত দাঙ্গা, ১৯৫০-এর 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলন ও ১৯শে মে ভাষা আন্দোলনের ফলে আসামে বাঙালিদের অবস্থান ও ইতিহাস নতুন খাতে বইতে শুরু করে।

১৯৫৩ সালে আসামের মুখ্যমন্ত্রী বিমলা প্রসাদ চালিহা-র সময় বিধানসভায় এক বিল পাশ করে নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়। ঐ আইনে বলা হয় : 'The business of the House shall be transacted in Assamese or in English.' এর আগে পর্যন্ত বিধানসভায় অনসমিয়াদের বেলায় বাংলা, ইংরেজি কিংবা হিন্দি ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপনের বিধান ছিল। ১৯৫৩ সালের মে মাসে কামরূপ জেলার নলবাড়িতে এক সভায় অসমিয়া নেতা

শ্রী মতিরাম বোরাই বলেন, 'আসামের খাঁটি অসমিয়াদের জনসংখ্যা মাত্র ৩০ লাখ।' তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বড়দলুই নিঃশঙ্কচিত্তে ঘোষণা করলেন, 'আসাম অসমিয়াদের জন্য। বাঙালিরা যবন-কাফের'। অসমিয়াদের এই ভাষাগত বিদ্বেষ কেবলমাত্র ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক –যাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রেকে প্রভাবিত করেছিল। আসামের বাঙালি অধিবাসীদের উপর নেমে এসেছিল অত্যাচার নির্যাতন। মুখ্যমন্ত্রী বিমলা প্রসাদ চালিহা বিধানসভায় বললেন, এই দাবি রাজ্যের অসমিয়াদের। "If therefore, Assamese has to become the official language in any part of the India, Where else can it so become if not in Assam?" অর্থাৎ যদি অসামিয়াকে ভারতের কোনো রাজ্যের সরকারি ভাষা রূপে স্বীকৃতি লাভ করতে হয় তাহলে তা আসামে না হলে আর কোথায় হবে? এই ভাষিক আক্রমণের বিরুদ্ধে আসামের বাঙালিরা তীব্র প্রতিবাদ জানায়, আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তোলে। সমগ্র আসাম জুড়ে এই আন্দোলনের প্রভাব থাকলেও এই আন্দোলন ছিলো মূলত বরাক উপত্যকা কেন্দ্রিক। আসাম রাজ্যের কাছাড়, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ জেলায় দীর্ঘকাল যাবৎ বাঙালিদের বসবাস। বারক নদীর উপকুল জুড়ে এই তিনটি জেলার অবস্থান হওয়ায় একে বরাক ভ্যালি বা বরাক উপত্যকা বলা হয়। বরাকবাসী বাঙালি বলে এক বরাকবঙ্গও বলা হয়। সরকারের দমন—পীড়ন যতই বাড়তে থাকে, মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলন ততই মারাত্মক আকার ধারণ করে। আন্দোলনের কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৯৬১ সালের ১৯শে মে শিলচর শহরে ধর্মঘট চলতে থাকে। ভাষা সৈনিকেরা শিলচরের রেলপথ অবরোধ করলে আসাম রাজ্য সরকারের রাইফেলস বাহিনী অবরোধকারীদের উপর গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই গুলিবিদ্ধ হয়ে ১১ জন প্রান হারান, আহত হন অনেকে। এগারো জন ভাষাশহীদের আত্মবলিদানের বিনিময়ে আসাম সরকার বরাক উপত্যকার জেলা পর্যায়ে সরকারি ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দেয়। তারপর থেকে প্রতি বছর ১৯শে মে ভাষাশহিদদের স্মরণে 'ভাষাশহিদ দিবস' পালিত হয় বরাক উপত্যকায়।

১৯শে মে-র ভাষা আন্দোলন পরবর্তী উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, সঙ্গীত অর্থাৎ সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতিটি শাখা ভাষা আন্দোলনের দ্বারা কোনো না কোনো ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল বা আজও হয়ে চলছে। কিন্তু স্বাধীন ভারতে বাংলা ভাষার জন্যে আত্মাহুতি দানের এই গৌরব আজও পশ্চিমবঙ্গে যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করে না, --এ কি শুধু বিস্মৃতি? উপেক্ষা? অজ্ঞতা? উন্নাসিকতা? না অন্য কিছু –এ প্রশ্নের উত্তর জানা নেই; অথচ বরাকের ভাষা সংগ্রামে পশ্চিমবঙ্গবাসীরাই ছিলেন অতন্দ্র প্রহরী ও সংগ্রামী সহচর। ভাষা সংগ্রাম নিয়ে বরাকবাসীর এরূপ নানা প্রশ্ন ও সংশয়ের চিত্র তুলে ধরেছেন শেখর দেবরায় তাঁর পথনাটক 'কালের পদাবলী'তে।

নাট্যকার শেখর দেবরায় (১৯৫৭)-এর জন্ম আসামের কাছাড় জেলার শিলচর শহরে। এই বরাকবঙ্গবাসীর আন্দোলন-সংগ্রাম এবং ঐতিহ্যের আবহের সঙ্গে বেড়ে উঠেছেন শেখর দেবরায়। একাধারে তিনি নাট্যকার, নাট্য পরিচালক, অভিনেতা, গীতিকার, গায়ক। রবার্ট ব্রাউনিং সম্বন্ধে ল্যান্ডর এবং কার্লাইল বলেছিলেন : 'আইন কিংবা কূটনৈতিকতা অথবা

যাতে মাথার দরকার হয় এমন যে কোনো পেশায় তিনি ব্যুৎপত্তি দেখাতে পারতেন' শেখর দেবরায় সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। শেখর দেবরায় বাংলায় এম. এ. করেছেন আসামের গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ছাত্র জীবন থেকেই নাটক রচনা শুরু করেন তিনি। ১৯৮৭ সালে তিনি তাঁর প্রথম মঞ্চনাটক 'অন্তিমের সুর' রচনা করেন। এরপর একে একে তিনি রচনা করেছেন- 'বংশধর' (১৯৮৭), 'সমাগত মহাকাল' (১৯৯৮), 'মনসার কথা' (২০০১), 'আত্মারামের আত্মকথন' (২০০২), 'রইদ রাজার কইন্যা রূপবতী নাম' (২০০৫), 'রূপান্তর' (২০০৯), 'শিলালিপি' (২০১১), 'আরও এক অভিমন্যু' (২০১৪) ইত্যাদি। বরাক উপত্যকায় বাঙালী জনগোষ্ঠীর লড়াই সংগ্রামের ইতিহাস ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলী নিয়ে রচনা করেছেন পথ নাটক 'কালের পদাবলী' (১৯৮৫), 'তোতা কাহিনি' (১৯৯১), 'পোস্টমর্টেম' (২০০৩), 'পথের সন্ধানে' (২০০৪), 'মৃত্যুকূপ' (২০০৮), ও 'প্রজন্ম' (২০১০)। এর মধ্যে 'কালের পদাবলী', 'পোস্টমর্টেম' ও 'প্রজন্ম' বাংলা ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত।

➢ কালের পদাবলী

শেখর দেবরায়ের 'কালের পদাবলী' বরাক উপত্যকার ভাষা আন্দোলনের বিষয়কে কেন্দ্রকরে রচিত। নাটকটি প্রথম মঞ্চায়ন হয় ১৯শে মে ১৯৮৫ সালে। শিলচর কালচারাল ইউনিট'-এর প্রযোজনায় 'কালের পদাবলী' কাছাড় জেলার শিলচর শহরে ভাষাশহিদদের বেদী প্রাঙ্গণসহ সারা বরাক উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে ১৯৮৫ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বহুবার অভিনীত হয়েছে। নাটকটি মূদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয় 'সাপ্তাহিক বরাককণ্ঠ'—তে ১৯শে মে ২০১০ সালে। 'কালের পদাবলী' ভাষা আন্দোলনের পঁচিশ বছর পূর্তিতে অভিনীত প্রথম পথনাটক। নাট্যকার এই নাটকের কাহিনিতে সময়কে নানান কৌণিক দিক থেকে ব্যবহার করেছেন। নাটকের কাহিনি সময়কে ধারণ করে এগিয়ে চলে। অতীত, বর্তমান, ভবিষাৎ ও সময় এ নাটকের পাত্রপাত্রী। এর সঙ্গে যুক্ত হয় তিনজন কোরাস ও সাধারণ জনগণ। সময় এ নাটকে অতীত ও বর্তমান-এর বর্ণিত কাহিনির সমন্বয় সাধন করে। কোরাস নাটকের সমগ্র ঘটনার সঙ্গে সহযোগী রূপে ক্রিয়াশীল থাকে। প্রথমেই কোরাসদের সঙ্গে নিয়ে স্বরবর্ণ পাঠ করতে করতে মঞ্চে আসে অতীত ও বর্তমান। তারপর মাদারী খেলার সাজ পোষাক পরিধান করে মঞ্চে আসে সময়। সময় দর্শকদের আহ্বান করে, প্রণাম জানায়, বাংলাদেশে ২১শে ফেব্রুয়ারি, বরাক উপত্যকায় ১৯শে মে-এর তাৎপর্য এবং মানুষ ও অমানুষের চিত্র তুলে ধরে। নাট্যকার এর পরেই অতীত (অতীতের অন্য নাম ইতিহাস) নামক চরিত্রের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস দর্শক সম্মুখে উপস্থান করেন। অতীত বলে, 'নানান দেশ নানান নামে আমি ভূষিত। কখনও ২১শে ফেব্রুয়ারি। কখনও ১৯শে মে। তবে এই দেশে আমার নাম ১৯শে মে'। প্রতি বছর এই দিনে সাধারণ মানুষের মাঝে উপস্থিত হয়ে সে তার অনুভূতিপ্রকাশ করে এভাবে –'আ... আজ আমার ভেতরটায় কি শান্তির হাওয়া লাগছে। হ্যাঁ আমি এসেছিলাম সেই পূণ্য তিথি ১৯শে মে তে আমি এসেছিলাম দেশে রাজ্যের এই ছোট্ট জেলাতে ঠিক দুপুর ২:৩০ মিনিটে। তারপর এক এক করে আমার এগারোটি শক্তিশালী বীজ হারিয়ে গেল। পড়লো দশটা বীর আর একটি বীরঙ্গনা। ঐ বর্বর বুলেটের আঘাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে --- জান দেবো জবান দেবো না। মায়ের ভাষা-প্রাণের ভাষা মাতৃভাষা জিন্দাবাদ'।

ভাষা আন্দোলনের বিভীষিকাময় ঘটনাবলী মনে করিয়ে দেয় বর্তমান প্রজন্মকে বর্তমান মাতৃভাষার জন্য যারা প্রাণ দিয়েছেন তাদের সেই বাংলা ভাষা এ কালে কেমন আছে তার চালচিত্র তুলে ধরে দর্শক ও পাঠকদের কাছে। বর্তমান বাঙালিদের বাংলা ভাষার বেহালচিত্র দেখে হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। যারা ভাষা আন্দোলনের দাবিকে উপেক্ষা করেছিল, রাইফেলের গুলিতে ১১ জন বাঙালির তাজা রক্ত শোষণ করেছিল তারা এবং তাদের দোসররা আজও বাঙালি ও বাংলা ভাষাপ্রেমীদের ভয় দেখায়, লোভ দেখায়, চক্রান্তের বীজ বপন করে। তারা বাঙালিদের মুখের ভাষা গ্রাস করতে চায়, ধ্বংসস্তুপে পরিণত করতে চায় বাঙালি সংস্কৃতিকে। ভয়ে ও দুর্বলতায় বাঙালি তার বাংলা ভাষায় কথা বলতে যেয়েও কেঁপে ওঠে। এরূপ অবস্থায় বর্তমান আর্ত চিৎকার করে বলে-- 'কেন তোমরা এভাবে আমাকে যন্ত্রনা দিচ্ছ, ভয় দেখাচ্ছো? আমি যে আমার মধ্যেই সুন্দর অতীতকে নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই।--- আমি চাই আমার প্রাণের মধ্যে জন্ম নিক এক একটা সুন্দর ভবিষ্যত'। এ সময় কোরাস ও দর্শকদের মধ্য থেকে আওয়াজ উঠে 'কারা বাঙালিদের মুখের ভাষা গ্রাস করতে চায়? কারা বাঙালির ঐতিহ্যকে ধ্বংস করতে চায়?' বর্তমান তখন বলে 'হ্যাঁ আমি চিনি ওদের সবাইকে জানো ওরা বড়ই চতুর। তাইতো ওরা সবার সামনে সুন্দর কথার বর্ণমালা সাজায়আর সময় সুযোগ পেলেই সেই মালাকে আবার চাবুক বানায়। ---ওদের কালো হাতকে ভেঙ্গে দিতে পারছি না কেন—কিসের জন্য ওরা আমাকে এগিয়ে যেতে দিচ্ছে না। ওরা কি জানে না আমার দুঃসময়ের কথা? ওরা কি এখনও বুঝতে পারে না? তোমরাই বল?'

উল্লিখিত সংলাপ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জনতা সমস্বরে বলে ওঠে 'জানি ওরা কালনাগিনীর মত বিষাক্ত'। বাঙালিরা জানে, ওরা সুযোগ পেলে আবার ছোবল মারবে। কিন্তু তাতেও বাঙালিরা ভয় পায় না, সামনের দিকে এগিয়ে যায়। 'ভয় করছো কেন- তুমি তোমারই ঐতিহ্যভরা অতীতকে অবলম্বন করে আরও আরও দৃঢ় চিত্তে এগিয়ে যাও— আরও এগিয়ে যাও'। তারপর বর্তমান নাটকটির পাঠক দর্শক শ্রোতাদের সঙ্গে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলে এবং বলে- 'শহিদ বিজয়ী হয়, সে বিজয় গাঢ়রক্তে মাখা'। এর সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হয় 'মহত্ত্বের ইতিহাস লেখা হয় / রক্তের অক্ষরে- / রক্তবাণী লেখা থাকে চিরন্তন কালের সূচিতে'। এভাবেই নাট্যকার তাঁর 'কালের পদাবলী' নাটকে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস অতীত ও বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে তুলে ধরেছেন। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে বাঙালি সংস্কৃতি ও বাঙালির মাতৃভাষা বাংলাকে আরও দ্যুতিময় করার লক্ষে সকল পেশার মানুষ ও নবীন প্রজন্মের কি করণীয় তা নৃত্যগীত ও গদ্য-পদ্য সংলাপে প্রকাশ পেয়েছে আলোচ্য নাটকটিতে।

➢ পোস্টমর্টেম

'পোস্টমর্টেম' নাটকটি একটি পথ নাটক। নাটকটিতে নাট্যকার শেখর দেবরায় ভিন্ন ভিন্ন প্রজন্মের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে সংলাপের মধ্য দিয়ে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে ১৯শে মে'কে তুলে ধরেছেন।

দুই প্রজন্মের দুই প্রতিনিধি বাবা ও ছেলের মধ্যে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নাটকের শুরু—

ছেলে : বাবা উনারা কিসের গান গাইছেন?
বাবা : বাংলা গান, আজতো ১৯শে মে তাই এই গানখানি গেয়ে শহিদ দিবস পালন করছেন।
ছেলে : শহিদ দিবস!
কোরাস : হ্যাঁ, শহিদ দিবস। স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম ভাষা শহিদ ।
ছেলে : কেমন করে হলো?
কোরাস : মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার্থে পুলিশের বুলেটে বিদ্ধ হলো এগারোটি তাজা প্রাণ'।

এইভাবে বাবা—ছেলে—কোরাসের সংলাপ ও গানের মধ্য দিয়ে নাটক কিছু দূর এগিয়ে যাওয়ার পর আমরা দেখতে পাই আরেক প্রজন্মের প্রতিনিধি এক বৃদ্ধকে।

বৃদ্ধ : গেল গেল— সব গেল
কোরাস : কি গেল দাদু? আজতো ১৯শে মে।
বৃদ্ধ : সেজন্যেই বলছি দেশটা রসাতলে গেল। ফুটপাত নেই, রাস্তা নেই, লাইট নেই, শুধু লম্বা-চাওড়া বুলি। চোখে পড়ে ঠুলি।...
বৃদ্ধ : নেই নেই, মানুষ নেই, আগের দিনের মতো সৎ, নিষ্ঠাবান, সর্বত্যাগী, পরহিতকারী সদা জাগ্রত চেতনার এমন মানুষ নেই। এখনতো কেবল দালালের ছড়াছড়ি'।

বৃদ্ধের কথা থেকে আমরা বুঝতে পারি তিনি তাঁর সময়ের সাথে বর্তমান সময়কে মেলাতে পারেন না। সমাজের বর্তমান অবস্থা দেখে তিনি বিরক্ত। কোরাসের মধ্য দিয়ে নাট্যকার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে দেন,

কোরাস : তাহলে এই অবস্থার জন্যও দায়ী কে? আমি, তুমি, না এই ব্যবস্থা?

হতাশাবাদী মধ্য বয়স্ককে কোরাসের প্রশ্ন 'কোনো দিন একক কিংবা সংগঠিত হয়ে প্রতিবাদের মিছিলে সামিল হয়েছিলেন বড়ভাই?'

কোরাসের এই প্রশ্ন শুধু কোনো বড়ভাইকে নয়। প্রশ্ন আমাদেরকেও, আমরা যারা

'অন্নপায়ী বঙ্গবাসী
স্তন্যপায়ী জীব
জন-দশেকে জটলা করি
তক্তপোশে ব'সে
ভদ্র মোরা, শান্ত বড়ো,
পোষ-মানা এ প্রাণ
বোতাম-আঁটা জামার নিচে
শান্তিতে শয়ান'

–করেই জীবনটা কাটিয়ে দেই বা কাটিয়ে দেওয়ার কথা ভাবি।

আধুনিক প্রজন্মের প্রতিনিধি ১৫-১৬ বছরের এক ছাত্রের মাধ্যমে আধুনিক প্রজন্মের চিত্র তুলেধরেছেন শেখর দেবরায়।

ছেলে : দাদু গেলেন দুঃখ পেয়ে
বাবা চলেন নীরবে
আমি হলেম নতুন পুরুষ
সবাই বলে ভাবি প্রজন্ম
কোরাস : হে নতুন পুরুষ/ তুমি কি জানো / আজ ১৯শে মে?
ছেলে : কি করে জানব H.L.S.C দিয়েছি এখনো পর্যন্ত রেজাল্ট আউট হয়নি
কিন্তু H.S 1st year-এর টিউসন শুরু।

আবার যুবকের কাছে ১৯শে মে'র অনুষ্ঠান নিছক আনুষ্ঠানিকতা—

যুবক : হকলের লগে আমরাও কোরাস গানে গলা মিলাইমু।
আবার বুদ্ধিজীবী চরিত্রের দ্বারা সমাজের বুদ্ধিজীবীদের যথার্থ মুখটি তুলে ধরেন -
যুবক : ইতারে কয় আসল সিয়ানা বুদ্ধিজীবী। বুদ্ধি করিয়া তাও প্যাঁচ করিয়া
হকল সুযোগ সুবিধা লইয়্যা যারা জীবন ধারণ করছন...তারারে ছাড়া
আমাদেরও চলে না।

আবার একজন বেকার যুবক যার ঐদিন ইন্টারভিউ আছে, যে একজন ভবিষ্যতের সরকারী কর্মচারী ভাষাশহিদ দিবস সম্পর্কে তার নুন্যতম জ্ঞান পর্যন্ত নেই, যে ভাষায় আমরা কথা বলি সেই ভাষার সম্মান রক্ষার্থে যে এগারোটি তাজা প্রাণ ঝরে গেল বর্তমান প্রজন্ম তাদের নামটি পর্যন্ত ভুলে গেছে। কিন্তু ঐ যুবক বলে, সে বুঝতে পারে --'এর জন্য আমি দায়ী নই। মা বাবা ইংরেজি স্কুলে এডমিশন দিয়েছেন, সেখানে কোনো দিন ২৫শে বৈশাখ, ১৯শে মে নিয়ে চর্চা হয়না, তাহলে জানা বা শেখার সুযোগ কোথায়?' কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে বাবার মনে হয়—

বাবা : একটা কথা কেন বার বার ভুলে যাও আমরা সবাই একটা বিশেষ অর্থ—সামাজিক—রাজনৈতিক পরিস্থিতির চাপে নিজেদের জীবন সংসার নিয়ে Compromise adjustment করতে বাধ্য। এই জীবন যন্ত্রণা থেকে বেরোনোর কোনো শর্টকার্ট রাস্তা নেই। সেখানে আমার সন্তানকে ইংরেজি সেখানো অন্যায় নয়।...সবাই বুকে হাত দিয়ে বলুকতো আমরা কি শখ করে হাজার হাজার টাকা খরচ করে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াচ্ছি? আসলে আমরা সত্যিই অসহায়। শেষ পর্যন্ত বাবা আসলে আমরা মুখোমুখি হই ১৯শে মে'র শহিদদের,--
শহিদ: ...আমরা প্রত্যকবার ১৯শে মে তে আসি দেখতে চাই আমাদের অঙ্কুর থেকে নতুন কোনো গাছ জন্ম নিয়েছে কিনা। তোমাদের সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাই, ১৯ মানে জেগে থাকা / ১৯ মানে জাগানো।

—এই জেগে থাকা ও জাগানো প্রতিটি ১৯শে মে-কে সামনে রেখে নিজেকে পোস্টমর্টেম করার, নিজেকে ফিরে দেখার।

➢ **প্রজন্ম**

২০০৮ সালের ১৯শে মে-র প্রাক্কালে শেখর দেবরায় 'প্রজন্ম' নাটকটি রচনা করেন। নাটকটির শুরুতেই ঘোষকের মাধ্যমে লেখক জানিয়ে দেন—

ঘোষক : ...আজ থেকে ঠিক ৪৮ বছর আগে শিলচর রেল স্টেশনে পুলিশের গুলিতে যারা প্রাণ বিসর্জন দিয়ে মাতৃভাষার অধিকার রক্ষা করেছিলেন আমরা হলাম তাদেরই পরবর্তী প্রজন্ম'।

'ঘোষক (2) : প্রজন্ম মানে শুধু শরীরের ধমনীতে রক্ত প্রবাহ নয় বরং বলা যায় গৌরবজ্জল অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে মেধা ও শক্তি নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলা'।

'ঘোষক (৪) : মানুষের চিন্ত-চেতনা—বোধ-বুদ্ধি দিয়ে জীবন রথের চাকা ঘুরতেই থাকে। যেদিন থেমে যাবে সেদিনই হলো মানুষের মৃত্যু'।

চরৈবেতি-ই আমাদের জীবন। একটি মধ্যবিত্ত সংসারের ছবি তুলে ধরেন শেখরদেব। যেখানে বাবা মিথ্যে বলে সহকর্মীকে আবার ছেলে মিথ্যে বলে বাবাকে। এইভাবেই মিথ্যের উপর একটি সংসার টিকে থাকে। কোরাসের মাধ্যমে তিনি ছবিটি তুলে ধরেন—

কোরাস : ঘর বাড়ি অফিস কাছারী
মাঝখানে খাওয়া দাওয়া ঘুম
ঘুম নির্লিপ্ত, নিশ্চিন্ত ঘুম'।

১৯শে মে-র মিছিল দেখে বাবা কে ছেলে (সনি)'র প্রশ্ন—

সনি : আচ্ছা বাপি এই দিনটা সেলিব্রেট না করলে কোনো প্রবলেম হবে ?

সনি শহিদবেদিতে মালা দিতে যেতে চাইলে বাবা বলে—

বাবা : নানা এখন এইসব করার সময় নয়, সামনেই তোমার entrance Exm তুমারে যেমন করেই হোক ভালো স্কোর করতেই হবে।

মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধসম, চরিদিকে শুধু সুখ সাচ্ছন্দের ঝিলমিল হাতছানি, রঙিন স্বপ্ন দেখিয়ে নিজেদের ঐতিহ্য ভুলিয়ে রাখার বিশাল বিশাল নেটওয়ার্ক। 'প্রজন্ম' নাটকে আমরা দেখতে পাই সমাজের আরেক প্রতিনিধি ব্যবসায়ী। যে বাড়িতে খাওয়ার জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করতে পারে সে সামান্য ২০ টাকা চাঁদা দিতে পারে না। ব্যবসায়ীর প্রশ্ন '১৯/২০ কইরয়া কিতা হইত?'

এইভাবে চলে আমাদের মাতৃভাষার প্রতি সম্মান জানানো প্রক্রিয়া। এমনভাবেই নাটকের অগ্রগতির সাথে উঠে আসে নেতা চরিত্র, আসে শিলচর স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে 'ভাষাশহিদ স্টেশন' করার কাহিনি। মানুষের প্রতিদিনকার প্রয়োজন উঠে আসে তৃতীয় ব্যক্তি এবং কোরাসের কথোপকথনের মাধ্যমে। '...এক দিকে দিনের পর দিন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের দাম অইন্যদিকে ভাঙ্গা চুড়া রাস্তা, মরণপাত ধুলাবালি খাইতে খাইতে আমরা হলে জিন্দা শহিদ হই যাইয়ার ইতার কিতা হইব?' যে সমস্যার মুখোমুখি প্রতিটি মানুষকে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে হতে হচ্ছে। কিন্তু এর সমাধান কি?—

তৃতীয় ব্যক্তি : আন্দোলন ফান্দোলনে কাম হইত না? তখন অইন্য রাস্তা দেখতে হইবো। আশ্চর্য্য, আমরা কিতা মানুষ না নি ? সরকার, ঠিকাদার, আমলা, চামলা, নেতা, মন্ত্রী তারা কিতা এই ভাঙ্গা রাস্তা দিয়া যাওয়া আসা করে না নি?'

পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তাঁর আবেদন-- 'আপনেরাই কইন আমরাতো বুড়া হইগেছি—অখন তুমরা যুবসমাজরা কিছু কর'। এই ভাবেই লেখক সকলের প্রতি আবেদন জানিয়ে মাতৃভাষার সকল শহিদ বীর সেনানীদের প্রণতি জানিয়ে–নিজেদের ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব রক্ষার তরে সবাই মিলে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সমগ্র নাটকটিতে গদ্যে, পদ্যে, গানের মধ্য দিয়ে নাটকটির মধ্য দিয়ে বর্তমান প্রজন্মের কাছে ১৯শে মে'র ভূমিকা তুলে ধরেন।

কষ্ট

শঙ্কর দাস
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

আপন মনে বসে সে
জানে না সে কি করে!
চেনা সবকিছু অচেতনতা ঘিরে,
আকুল মনে ব্যাকুল হয়ে,
মন ময়ূরী খোঁজে!
চেনা পৃথিবীতে আজও সে একা !
কেউ বোঝে না তাকে।
সবাই যখন ব্যস্ত থাকে
এই রঙিন দুনিয়াতে ,
গোধূলি লগ্নে ধরা দিল
আমার চোখের পাতাতে!

খেলা হবে

অনুশ্রী গুছাইত
প্রাক্তনী, জীববিজ্ঞান বিভাগ (স্নাতক, সাধারণ)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

খেলা হবে
শৈশবের খেলা ঘরে খেলায় খেলায়।
বিজেতার পরিচয়ে কেটে যায়
অভাবের ঘেরাটোপ জীবন।
বিরূপ প্রতিযোগিতার ময়দানে
শুনেছি বারংবার,
“খেলা হবে, খেলা হবে...”
খেলতে খেলতে বলটা পা ফসকে
গোলে চলে যাবে ভাবা কি যায় !
তবুও বলটা গোলে !
শুরু হয়ে যায় জীবন নাট্যের নতুন খেলা।
খেলতে গিয়ে ডিস্কোয়ালিফাইড !
বাঁশি বাজে ।
মাথা নিচু করে মাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে শুনি ,
“খেলা হবে, খেলা হবে ...”
খেলা তো শুরু হয়ে যায়-
অপমানের খেলা, দায়বদ্ধতার খেলা, ব্যালেন্সের খেলা।
ছুঁতে চেয়েছি মন ;
হৃদয় জুড়ে মাঠে লালকার্ড দেখি,
আর শুধু শুনি ,
খেলা হবে,
আবারও খেলা হবে।

সাফেল্যর জন্য সংকল্প

মির্জা মোজাম্মিল
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাণিজ্য বিভাগ
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

কিছুই অসম্ভব না যদি আপনার থাকে ইচ্ছা,
প্রতিটি বাধা সরে যাবে যদি দাও ধাক্কা!

ভুল করবেন না সুযোগ আছে।
আপনি জানেন যে ইতিমধ্যে বড় তাড়া আছে।

আপনি কাউকে নাড়াচাড়া না করে এগিয়ে যান উচছ্বাস নিয়ে,
উদ্যোগ এবং দৃঢ় সংকল্প তৈরি হবে সত্যিকারের শিক্ষা দিয়ে।

পৃথিবীর স্থির নয়, গতিশীল- এটি আপনার সাথে এগিয়ে যাবে।
শুধুমাত্র ইচ্ছার সংকল্প হলে লক্ষ্য অর্জন সমপন্ন হবে।

সংকল্প হল একক নির্ধারক।
সংকল্প পরিবর্তনশীল নয়, এটি ধ্রুবক।

সংকল্প চুড়ান্ত ফলাফল নির্ধারন করে,
অনেক প্রতিযোগীর মধ্যে বিজয়ী ও পরাজয়ী নির্ণয় করে।

ভাগ্য পরির্বতনশীল, পরির্বতনশীল নয় সংকল্প।
সফলতা এবং ব্যর্থতার মধ্যে পার্থক্যই হল সংকল্প।

শিক্ষা দিক্ষা জ্ঞানের মাধ্যমে করতে পারবেন সংকল্প।
সু-সংকল্পের চুড়ান্ত ফল হবে আপনার সাফল্য।

অনুভূতি

শ্রেয়সী কুন্ডু
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

নিত্যনৈমিত্তিক জীবনযাত্রার ধারাবাহিক ছন্দ পতন ঘটিয়ে সুদূর চীন দেশ থেকে corona নামক ভাইরাস মানুষ থেকে মানুষে ট্রান্সফার হয়ে অন্যান্য কয়েকটি দেশ ঘুরে স্বদেশে পৌঁছে বহু মানুষের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে। ২০২০, মার্চ মাস। প্রচলিত ধারা ভেঙ্গে সারাদেশ জুড়ে শুরু হল লকডাউন নামক একটি নিয়ম। এমতাবস্থায় সব মানুষ যে যত দূরে থাকুক না কেন বাড়ি ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এরমধ্যে আমিও ব্যাতিক্রম ছিলাম না। একদিন নিজের কর্মক্ষেত্রে ছেড়ে সকাল সকাল রওনা দিলাম বাড়ির উদ্দেশ্যে। দীর্ঘ ৯ বছর পর প্রায় কিছুটা পাকাপাকি ভাবে পুরানো জায়গাটাকে নিজের মত করে পুনরায় ফিরে পেলাম করোনার চোখ রাঙানো অঙ্গুলিহেলনে। বলতে পারি করোনার ভয়ে ভীত হয়েই একপ্রকার গ্রামের বাড়িতে ফেরা।

এতদিনের এত ব্যস্ততা, এত তাড়াহুড়ো, সবকিছুর সাথে প্রতিযোগিতার পর হঠাৎ গৃহবন্দি আমরা সবাই। বন্দিজীবন ভীষণভাবে বিরক্তিকর। তবে গ্রামের স্নিগ্ধ শীতল মনোরম পরিবেশ সব রকমের কষ্ট যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে পারে। এদিকে অনেক বছর পর মায়ের হাতের রান্না, বাবা-মায়ের সান্নিধ্য, সব ভাইবোন মিলে একসাথে থাকা, এটা একটা অন্য অনুভূতি। এই ভাললাগাটার পাশাপাশি করোনার করালগ্রাস যে মানুষের উপর ছায়া ফেলেছিল সেই কষ্টটা অন্য জায়গায়। জীবনে পড়ুয়া হিসেবে, শিক্ষিকা হিসাবে অনেক জীবন্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীকে যখন ঘর বাঁধতে দেখি সেই দেখা দিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয় সেটা ভাষায় প্রকাশ করা খুব কঠিন।

আমাদের বাড়িটা আমগাছ, নিমগাছ, পেয়ারা গাছ ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের ছোট বড় গাছ দিয়ে ঘেরা। ফলে বহু ধরনের প্রাণীর সাথে আমরা বাস করি একই জায়গায়। বিকেলের দিকে তেমন কোনো বিশেষ কাজ না থাকায় সেই সব প্রানীর গতিবিধি লক্ষ্য করতাম ছাদ থেকে। একদিন হঠাৎ বাবা বলল, "আমাদের ছাদের দিকে হেলে থাকা আম গাছের ডালটায় বুলবুলি পাখি বাসা বেঁধেছে।" শুনেই ভীষণ উৎসাহের সাথে বাচ্চাদের মত সবাই মিলে ছুটে গেলাম ছাদে। যেতে যেতে সিঁড়িতে আলোচনা হয়ে গেল কে আগে যাবে আর দেখবে। কারণ ওদের যেন আমাদেরকে দেখে ভয় না হয়, তাহলে হয়তো আর বাসায় ফিরবে না। যদি ছোট বাচ্চা থাকে তাহলে তারা খেতে পাবে না! যাইহোক আমি আগে গেলাম, গিয়ে দেখি, খুব ছোট ছোট, দুর্বল গোছের তিনটে বাচ্চা আছে ওই ছোট্ট বাসায়। আমার উপস্থিতিতে তারা মা ভেবে হাঁ করে খাবারের আশায় চিক চিক করে ডাকছে। দেখে তো খুশিতে মনটা ভরে গেল। পরপর সবাই দেখলাম। আর আমার আফসোস হচ্ছিল এই ভেবে যে আমি কেন আগে দেখতে পেলাম না, অথচ প্রতিদিনই এই ছাদটায় এসে দাঁড়াই। তাহলে হয়তো ওই পুঁচকে ডিমগুলোকেউ দেখতে পেতাম! যাইহোক এবার শুরু হলো তাদের রক্ষণাবেক্ষণের পালা। প্রতিদিন আমরা নিয়ম করে মা-বাবা বুলবুলি দের জন্য জলের বাটি রেখে আসতাম। কখনো খেতো কখনবা খেত না। তাদের বাবা-মা কাছাকাছি না থাকলে

একপ্রকার চুরি করেই দেখে আসতাম কতটা বড় হল। মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীরও যে সন্তানের প্রতি স্নেহ, ভালোবাসা সমান হয় সেটা বইতে পড়েছি কিন্তু নিজের চোখে দেখার সুখ অন্য সব কিছুকে ছাপিয়ে যায়। দিন দিন একটু একটু করে ছোট্ট শরীর দুটি একটা একটা করে কুটোকাটা সংগ্রহ করে ছোট্ট দুটি ঠোঁটে করে বয়ে নিয়ে এসে বারবার ভেঙে গড়ে কত না পরিশ্রম করে স্বপ্নের একটা সুন্দর বাসা বানিয়েছে এবং অতীব সুন্দর শিল্পকলা দিয়ে ও বিজ্ঞানসম্মত ভাবে, যেন ঝড়ের হাওয়ায় সহজে ভেঙে না পড়ে।

আমার বাড়ির ২ কিলোমিটার এর মধ্যে কোন পুকুর না থাকায় ওদের জল খেতে, স্নান করতে যেতে হয় বহুদূরের পুকুরে বা খাবার সংগ্রহও করতে হয় দূরে দূরে। যাবার আগে কোনো একজন অন্য ডালে বসে সতর্ক পাহারায় থাকে। বাসার কাছাকাছি গেলে প্রথম দিকটায় নিজের মতো করে কিচিরমিচির করে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করত। পরে ওরাও বুঝে গেছে ওদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা। মাঝেমধ্যে রাতের বেলা ঘুমাতে যাবার আগে ও দূর থেকে শুনে আসতাম বাচ্চাগুলোর চিকচিক ডাক। কেমন যেন মোহাচ্ছন্ন করেছিল আমায়। এদিকে আরেক পেয়ারা গাছের একটু উচু ডালে দুটি শালিক দম্পতি তাদের সুখের সংসার করেছিল। ওদেরকে দেখতে না পেলেও ওদের আসা-যাওয়া লক্ষ্য করতাম। প্রায়ই রাতের বেলা হঠাৎ হঠাৎ শুনতে পেতাম কর্কশ গলায় ভীষণভাবে গালিগালাজ করছে। বাড়ির বাইরে বেরিয়ে দেখি পেঁচা এসে তাদের বাসায় বাচ্চাদের নিয়ে যাবে বলে দাবি জানাচ্ছে। যেইনা দাবি করা ওমনি ওই বিশাল আকার প্যাঁচার ওপর তেড়েমেড়ে লেগে পড়তো। অনেক যুদ্ধের পর, অনেক তর্কাতর্কির পর পেঁচা কে তাড়িয়ে নিজের কচি বাচ্চা গুলোকে ঘিরে আবার সবকিছু শান্ত।

এদিকে সকাল হলেই বুলবুলি, শালিক ছাড়াও আরো অনেক ধরনের পাখি দেখতে পেতাম। প্রচুরসংখ্যক মৌটুসী পাখি তাদের সূচের মত সরু ঠোঁট নিয়ে আমাদের কলকে গাছের ফুলে, কখনও বা মাধবীলতার ফুলে ফুলে সামনে-পেছনে উড়ে উড়ে মধু খেত আনন্দে। একঝাঁক টিয়া পাখি, শালিকের সংসার যে পেয়ারা গাছটায় সেই গাছে পেয়ারা খেয়ে একটি পেয়ারা সাথে করে নিয়ে উড়ে যেত নিজের গন্তব্যে। দুধরাজ (প্যারাডাইস ফ্লাই ক্যাচার) তার সুন্দর সাদা লম্বা লেজ নিয়ে এডাল ওডাল করে খাবার সংগ্রহ করত। পায়রা গুলো আপন-মনে বকম বকম করে দানা খেয়ে বেড়াতো। ঘুঘু পাখি নির্জন দুপুরে নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতায় ব্যস্ত থাকতো। আর দুষ্টু হাঁড়িচাচা এসে, সবার দুপুরের ঘুম নষ্ট করত। সন্তানের প্রতি যত্ন তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে বাঁচিয়ে রাখার তাড়না যে কি, সেটা শত্রুদের হাত থেকে নিজের জীবন দিয়ে, বুক দিয়ে আগলে রাখা দেখে বোঝা যায়। ছোটবেলায় কবিতায় পড়েছি- "আমি যদি হই ফুল হই ঝুঁটি বুলবুল হাঁস", কতবার সাধ হয়েছে পাখি হয়ে উড়ে যাব আকাশে। শিশু বয়সে হয়তো এমন সাধ সবারই হয়। কিন্তু আমার সে সাধ মেটেনি কোনদিন। কিন্তু জীবনযুদ্ধ বোধহয় মানুষ সহ অন্যান্য জীবের পাশাপাশি এদেরও কম কিছু নয়। ওড়ার মজা আছে ঠিকই, পাশাপাশি যুদ্ধটাও সমান ভাবে করতে হয় পৃথিবীর বুকে জীবকুলে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে। শত্রু প্রাণীর পাশাপাশি প্রকৃতি দেবী মাঝে মাঝে রুষ্ট হলে তো রক্ষে নেই। ঝড় তার রাক্ষুসে দাপট নিয়ে এসে নাড়িয়ে দিয়ে চলে যায় বহু পক্ষী দম্পতির সোনার সংসার। কেউ থাকে কেউ বা নীড়হারা হয়। অসম্ভব মন খারাপ আর

যন্ত্রণা নিয়ে কাটে বেশ কয়েকটা দিন। দেখেছি নিজের কচি বাচ্চাদের জল ঝড়ের দাপট থেকে কি করে রক্ষা করতে হয়। কালবৈশাখী ঝড়ের পাশাপাশি মনে পড়ে সেবার ভয়ঙ্কর আম্ফান ঝড় বাঁকুড়া জেলাতেও কম বেশি তাণ্ডব চালিয়েছিল। ঝড় শেষে টর্চ হাতে দৌড়ে যাই ছাদে, দেখি বাবা ও মা বুলবুলি পাখি দুটোর বাচ্চা ও বাসা উভয়কেই বাঁচানোর সেকি আপ্রাণ চেষ্টা। চুপচুপে হয়ে ভিজে গেছে দুটো শরীর, তবুও অসম্ভব কষ্ট সহ্য করে বাঁচিয়ে রেখেছে নিজের আঁতের ধনকে।

এমনি করে বড় হতে থাকল ওরাও। একদিন দেখি ওদের মা-বাবা ওদের উড়তে শেখাচ্ছে। প্রথমে নিচু ডাল তারপর ধীরে ধীরে উঁচু ডালে উড়ে এসে বসতে শেখাচ্ছে। পরবর্তী প্রজন্মকে বিশ্বসংসারে টিকিয়ে রাখার চেষ্টায় ব্রতী ওরা। বাচ্চাদের উড়তে পারার সাফল্যে আনন্দে আপ্লুত হচ্ছে ওরাও। শিখতে না চাইলে স্নেহের ঠোক্করও পেতে হচ্ছে বাচ্চাদের। খাবার সংগ্রহ করতে শেখানো ইত্যাদি সব মিলিয়ে সুখী দাম্পত্য জীবন কাটে ওদের। সুখানুভূতি ওদের কম কিছু নয়।

এমনি করে দিন যায়। ওরা আরও বড় হয়। প্রকৃতির নিয়মে হঠাৎ একদিন দেখি বাসা ফাঁকা করে ওরা সপরিবারে অন্য কোথাও চলে গেছে। অনেকবার গিয়ে দেখেছি কিন্তু আর কখনো সেই স্বপ্ন দিয়ে কষ্টে গড়া বাসাটায় ফেরেনি। হয়তো বা জানাতে চেয়েছিল যাবার আগে আমাদের! নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম এমনি করেই তো সবকিছু এগিয়ে যায় প্রকৃতিগত ভাবেই... আমরা ...ওরা... সবাই....সব্বাই...। মনে মনে ভাবলাম করোনার মতো অতিমারিকেও প্রকৃতির নিয়মেই অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যাব। বন্দি জীবন কাটবে আমাদের। ভাইরাস মুক্ত হবে আমাদের প্রিয় পৃথিবী। পড়ন্ত বিকেল, সূর্য অস্ত যায়। আপন-মনে গেয়ে উঠলাম রবি ঠাকুরের গান-

"আসা-যাওয়ার পথের ধারে কেটেছে দিন গান গেয়ে মোর।
যাবার বেলায় দেবো কারে বুকের কাছে বাজলো যে বীন।।
সুরগুলি তার নানাভাবে রেখে যাব পুষ্পরাগে,
মীড়গুলি তার মেঘের রেখায় স্বর্ণ লেখায় করব বিলীন।।
কিছু বা সে মিলন মালায় যুগল গলায় রইবে গাঁথা,
কিছু বা সে ভিজিয়ে দেবে দুই চাহনির চোখের পাতা।
কিছু বা কোন চৈত্র মাসে বকুল-ঢাকা বনের ঘাসে
মনের কথার টুকরো আমার কুড়িয়ে পাবে কোন উদাসীন।"

পোড়া মাটির শিল্প

গনেশ চন্দ্র পাল
ষষ্ঠ সেমেস্টার, কলা বিভাগ (স্নাতক, সাধারণ)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

এক সময়ে কুমোর পাড়ায় কাঁচা মাটির গন্ধে,
মাতোয়ারা থাকতো সবাই মন মাতানো ছন্দে।
ব্যস্ত সদাই থাকতো তারা নিজের নিজের কাজে!
হিমশিম খেতো অর্ডার নিয়ে, সকাল থেকে সন্ধ্যে।

নানা রকম চাহিদা নিয়ে আসতো হাজার ক্রেতা,
ঘুম ছিলো না রাতে তাদের ঘুরতো হাতে চাকা।
সাজিয়ে রাখতো পসরা তারা মৃৎশিল্পের যতো,
আনতো তারা হাট বাজারে তৈরি জিনিস কতো।

কুমোর পাড়ায় থাকতো পূর্ণ নানা রকম খেলনা,
বাহারি সব জিনিসপত্র , মাটির গড়া দোলনা।
বাপ -দাদার এ শিল্প যে আজ হচ্ছে ধীরে জীর্ন,
বেশির ভাগই কুমোর যে আজ পথ ধরেছে ভিন্ন।

কুমোর পাড়ার পল্লীতে সেই পোড়া মাটির গন্ধ,
আসে না আর নাকেতে আজ, বাজার বড়ো মন্দ।
হারিয়েছে আজ পাল পাড়ার কাঁচা মাটির গন্ধ,
আধুনিক সব জিনিসপত্র করেছে এসব বন্ধ।

মাটির ঘড়া, কলসি, হাঁড়ি, কিংবা সরাই-মটকা,
তৈরি করতে নেয়নি সময়, লাগেনি তো খটকা।
বাসন কোসন পেয়ালা সরা নিত্য তারা গড়তো,
পিঠে তৈরির ছাঁচও তারা মনের মতো করতো।

মৃৎশিল্প প্রাচীন শিল্প, কুমোর জাতির প্রাণ,
আসুন সবাই বাঁচাই আবার এই শিল্পের মান।
মাটির দ্বারা তৈরি শিল্প, মাটিই তাদের সব,
মাটির মাঝেই খোঁজে কুমোর মাটির কলরব।

মাটির তৈরি জিনিসপত্র ঘরের কোণে কোণে,
সাজিয়ে রাখে গৃহিনীরা তার সৌখিনতার জন্যে।
বাঁচাতে হবে এই শিল্প, মৃৎশিল্পের জন্য,
ধংস হতে বাঁচাতে পারলে দেশও হবে ধন্য।

তৈরি করুন জেলায় জেলায় মৃৎশিল্পের বাজার,
সচেতন করুন সবাইকে, উৎসাহ দিন আবার।

শিক্ষা ফিরুক ক্লাসরুমে

শিল্পা করশর্মা
চতুর্থ সেমেস্টার, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, (স্নাতক, সান্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

ভয়াবহ অতিমারি কোভিড-১৯ শুধু স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বা অর্থনীতিতেই নয়, শিক্ষা ব্যবস্থাতেও প্রভাব ফেলেছে। অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া জোরকদমে চলছে ও ঘুরে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টা সদা বিদ্যমান। শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র বিশ্বেই শিক্ষাখাতে এতবড় বিপর্যয় আগে কখনো আসেনি, হয়তো আসবেও না। সর্বপ্রকার ক্ষতিই কোনো না কোনো ভাবে পূরণ করা সম্ভব। কিন্তু করোনা শিক্ষায় যে প্রভাব ফেলেছে, তা সত্যিই অপূরণীয়।

করোনা মোকাবিলায় দেশের পর দেশ যখন লকডাউনকেই একমাত্র হাতিয়ার করেছিল, তখন ইন্টারনেট বা অন্তর্জাল ভিত্তিক শিক্ষাই একমাত্র উপায়। স্কুল, কলেজ ইত্যাদি বন্ধ থাকায় দুধের স্বাদ ঘোল দিয়ে মেটানোর মতো অনলাইন, টেলিভিশন ইত্যাদি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পড়ানোর চেষ্টা চলছে। কিন্তু পৃথিবীর প্রায় ৭৮ কোটি ছাত্র-ছাত্রীর জীবন এই কঠিন মরণব্যাধির জন্য দোদুল্যমান। যদিও এই ব্যাধি শিক্ষার্থীর যথেষ্ট ক্ষতি সহ্য করতে বাধ্য করেছে, তথাপি শিক্ষা ব্যাবস্থায় এই রূপান্তরের কিছু ব্যাবহারিক সুবিধা আমরা অস্বীকার করতে পারিনা।

শিক্ষার মূলত তিনটি প্রতীয়মান দিক রয়েছে-

১. বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও মনোহারি পাঠ তৈরি করা।
২. ক্লাস বা লেকচার বা স্বপাঠ বা আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষাদান দেওয়া।
৩. নানান পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কাজের মূল্যায়ন করা।
করোনার আবির্ভাবে এই তিনটি দিকই বিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে।

যদিও ভারতবর্ষের মতো দেশের বিভিন্ন জায়গায় ইন্টারনেটের লভ্যতা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন থেকেই যায়। এখনো বিপুল সংখ্যক ছাত্র ছাত্রীদের কাছে ইন্টারনেটের সুবিধে নেই। তাই অনলাইন শিক্ষার সুবিধা নিতে তারা অক্ষম। ভারতবর্ষের মাত্র ৭০ শতাংশ মানুষ মুঠো ফোন ব্যবহার করেন। তাই অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা সর্বজনীন করার মতো উপযুক্ত পরিকাঠামো এখনো তৈরি হয়নি বা সকল শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছায়নি। তবে এটাও সত্যি যে যদি করোনা অতিমারি আমাদের আক্রমন না করতো তাহলে অনলাইন শিক্ষা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একটি স্বপ্ন হয়ে থেকে যেত।

যদিও অনলাইন ক্লাসের ব্যাবস্থা রয়েছে কিন্তু সব জায়গা থেকে অনলাইন ক্লাস সম্ভব নয়। কারণ দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় এখনো নেটওয়ার্ক সেরকম পাওয়া যায় না। যার ফলে ভুগতে হচ্ছে আমাদের দেশের বড় সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের। সেইরকমই কর্ণাটকের দক্ষিণ কন্নড় জেলার একটি ছবি সম্প্রতি ফাদার্স ডে তে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া ও বৈদ্যুতিন

মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছিল। সেখানে অতি ভারী বৃষ্টির মধ্যে ফুটপাথে এক ছাত্রীকে অনলাইন ক্লাস করতে দেখা যাচ্ছে। আর বৃষ্টির জল আটকাতে মাথার উপর তাঁর বাবা ছাতা ধরে আছেন। পরে ছাত্রীটির থেকে জানা যায় তিনি বি.এ ডিগ্রির জন্যে পড়াশোনা করেছেন। তাঁর গ্রামে ইন্টারনেট পৌঁছায়নি। তাই তার মতো আরো ৩০-৪০জন ছাত্র-ছাত্রী এই করোনা অতিমারিতে বর্ষাকালেও রাস্তার ফুটপাথে এসে ক্লাস করেন সকাল 9 টা থেকে দুপুর 1 টা পর্যন্ত। একইভাবে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদেরও অতি বর্ষণে খোলা জায়গায় অনলাইন ক্লাস করতে হয়। এর মাধ্যমেই প্রত্যন্ত এলাকার ছাত্র ছাত্রীদের দুর্দশার ছবি সামনে চলে এসেছে। আর গত আমপান ও ইয়াস ঝড়ের প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ছাত্র ছাত্রীদের অবস্থাও বিভিন্ন নামি ইন্টারনেট সংস্থার অতি জঘন্য পরিষেবার ফলে খুবই শোচনীয় হয়ে উঠেছে।

করোনার কারণে এই বছর মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, সিবিএসই বোর্ড সহ বহু সর্বভারতীয় পরীক্ষা বাতিল হয়েছে। অর্থাৎ পরীক্ষা ছাড়াই শিক্ষার্থীদের কিছু নির্দিষ্ট মূল্যায়নের দ্বারা ফলাফল ঘোষণা হবে। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কাছে এটি যেমন জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা তেমন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কাছে এটি আবার উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের শেষ পরীক্ষা। এছাড়াও এই উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফলের ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষায় ভর্তি ও বিভিন্ন বৃত্তি মূলক কোর্স, দেশ বিদেশে পড়াশোনা ও স্কলারশিপ ইত্যাদি নির্ধারিত হয়। এইসব ক্ষেত্রে আবার যোগ্য শিক্ষার্থী বঞ্চিত হতেও পারে। যদিও সরকার বাহাদুরের কিছুই করার নেই। শিক্ষার চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশি। করোনা যখন সারা বিশ্বকে কাবু করেছে তখন শিক্ষার্থীদের জীবনের ঝুঁকি নেওয়ার আর কোনো সুযোগ নেই।

গতবছরের মার্চ মাস নাগাদ যখন করোনা রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকে তখন আমরা সবাই অস্থির হয়ে উঠেছিলাম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো কবে বন্ধ হবে। আবার বন্ধের মেয়াদ যখন প্রায় 6 মাস পেরোতে থাকে তখন থেকেই যৌক্তিক কারণেই আমরা আবার অস্থির হয়ে উঠি কবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলবে? শিক্ষার্থীরা সাধারণত ছুটি পছন্দ করে কিন্তু নজিরবিহীন ভাবে এই দীর্ঘ ছুটিতে তারাও অস্থির হয়ে উঠেছে। আসলে বাড়িতে সারাক্ষন অভিভাবকের কড়া নজরদারিতে থাকতে থাকতে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে উঠেছে। তাই তারা এখন ক্লাসে যেতে চায়। আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্লাসরুমগুলোতে শুধুমাত্র পড়াশোনা ছাড়াও শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলার সুযোগ থাকে। স্কুলে তারা একাডেমিক শিক্ষার সাথে সাথে জীবনের শিক্ষাও পায়। সামাজিক নেতৃত্ব, নৈতিকতা, বন্ধুত্ব ইত্যাদি সকল গুণের বিকাশ ঘটে।

বাড়িতে বসে কেউ মুখস্থ করলে পরীক্ষায় হয়তো অনেক নম্বর পাবে কিন্তু জীবনের পরীক্ষায় পাশ করা তার মুশকিল। স্কুল কলেজ বন্ধ থাকায় শুধু পড়াশোনার গতি নষ্ট হয়েছে তাই নয়। অনেকের মনযোগ নষ্ট হয়েছে, জীবনের লক্ষ্যও বদলে গেছে। দরিদ্র পরিবারের অনেক শিক্ষার্থীর হয়তো আর কখনো স্কুলে ফেরা হবে না। এইসময় কিছুক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ ও শিশুশ্রমের সংখ্যা বেড়েছে। তাই শিক্ষার গতি পুনরায় ফিরিয়ে আনা অনেক কঠিন কাজ। যদিও কঠিন তথাপি আমাদের সমগ্রভাবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ক্লাসরুমে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীরা ফিরলেই তবে নতুনভাবে প্রাণ ফিরে পাবে ক্লাসরুম।

মেঘ বালিকা

পায়েল প্রধান
চতুর্থ সেমেস্টার, বাংলা বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

মেঘ বালিকা, তুমি দেখতে কেমন?
তোমার ভবনা যেমন, মায়াবিনী চোখ, সুহাসিনী ঠোঁট, আর কতো কী !

মেঘ বালিকা, তুমি প্রেম করেছো ?
সে আবার কী? ও বুঝেছি
মোবাইল ফোনে রাত দুপুরে মিষ্টি করে ডাকাডাকি, "হ্যাঁ গো কি করছো?" ইত্যাদি ইত্যাদি...
না, মশাই এসব থেকে মাফ চাই ।

মেঘ বালিকা, তোমার জাত কী? তুমি হিন্দু না মুসলিম ?
কী জানি গো? সব পুরুষই আমায় নিয়ে স্বপ্ন আঁকে, সুযোগ পেলে কাছে ডাকে, সুখ খোঁজে শরীরের ভাঁজে!
বুঝবো কি জাত কী সে...।

মেঘ বালিকা তুমি বিয়ে করবে ?
বিয়ে! ওরে বাবা, নিজের অধিকার অন্যকে দেওয়া, বিনিময়ে সামান্য পাওয়া,
কথায় কথায় যৌতুক চাওয়া, না পেলে তাড়িয়ে দেওয়া...
আমার বান্ধবি কবিতা, ও একবার করেছিল বিয়ে
যৌতুক না দিতে পেরে মরেছিল গলায় দড়ি দিয়ে ।
এ যে বড়ো অভিশাপ, তাই মশাই, বিয়ে থেকে চাই মাফ !

মেঘ বালিকা, এবার কাছে এসে হাতটি ধরো।
ও... তোমার চালাকি সব বুঝেছি
এবার ভালোয় ভালোয় কেটে পড়ো।

কোভিড পরিস্থিতিতে অনলাইন শিক্ষা: এক শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গি

অরিন্দম ভট্টাচার্য
চতুর্থ সেমেস্টার, ইংরেজি বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

কোভিড-১৯ এই শব্দটির সাথে এখন গোটা বিশ্বের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই পরিচিত। ভারতে প্রথম রোগটি ধরা পড়ার কথা জেনেও আমরা যতটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ছিলাম, ১১-ই মার্চ, ২০২০ WHO প্রধানের এই রোগকে মহামারী হিসেবে ঘোষণা করা থেকে শুরু করে আজ ২০২১ এর জুলাই মাসে দাঁড়িয়ে ভারত তথা গোটা বিশ্বের দিকে তাকিয়ে বিষয়টিকে আর হালকাভাবে নেওয়া চলে না।

যেখানে পৃথিবীর সমস্ত ক্ষেত্রের ওপরেই কোরোনার থাবা পড়েছে সেখানে শিক্ষা ব্যবস্থাই বা আর বাদ যায় কিভাবে। ফলস্বরূপ পৃথিবীর প্রথম সারির দেশগুলোর মতো ভারতকেও ২০২০র ২৩ শে মার্চ থেকে ধাপে ধাপে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে বন্ধ করতে হয়। তা বলে কি প্রগতি রথের মূল চাকা শিক্ষা থমকে থাকবে? এক শিক্ষার্থী হিসেবে আমি তা কখনই চাইব না। সে দিক থেকে বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে বেছে নিতে হয়েছে অনলাইন শিক্ষা পদ্ধতি বা E - learning ।

E - learning আমাদের অনেকের কাছে নতুন হলেও পাশ্চাত্যে বহু আগে থেকে এর ব্যবহার হয়ে আসছে। ভারতে প্রথম সারির কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে E- learning ব্যবহার হয়ে আসছে কিন্তু এর সার্বজনীনভাবে ব্যবহার শুরু হয়েছে এই করোনাকালে শিক্ষাব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার জন্য। স্বশরীরে উপস্থিত না থেকেও কেবল ইন্টারনেট মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষা প্রদান বা শিক্ষা গ্রহণের সামগ্রিক পদ্ধতিটি E-learning নামে পরিচিত।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক BF.Skinner-এর হাত ধরে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে "Computer Based Training Programme " পৃথিবীর কাছে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৮২ সালে প্রথম এটিকে শিক্ষামূলক ভাবে ব্যবহার করে ক্যালিফোর্নিয়ার "Western Behavioral Science Institute" নামে এক বিশ্ববিদ্যালয়। এরপর এটিকে পাকাপাকি ভাবে ব্যবহার করেন বিখ্যাত Glen Jones এবং Barnand Luskin তাদের সৃষ্ট মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (open university)"Jones International University"। ১৯৯৯ সালে Elliott Masie এই "Computer Based Training Programme" এর নাম পরিবর্তন করে E- learning শব্দটি ব্যবহার করেন। যা আজ আমাদের সকলের কাছেই পরিচিত। এই E-learning প্রযুক্তিটি ভারতে আসে "Indira Gandhi Open University" এর উদ্যোগে E-Gyankosh নামে। এরপর থেকে সরকারি উদ্যোগে দেশের বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও কিছু প্রথম সারির স্কুলে এই প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু হয়েছে এবং ভবিষ্যতে দেশের সমগ্র প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই সুবিধা চলে আসবে।
ব্যবহারিক দিক থেকে দেখতে গেলে E-learning ছাত্র সমাজের কাছে বিজ্ঞানের এক বিশেষ আশীর্বাদ কারণ - এর মাধ্যমে কোন শিক্ষার্থী পৃথিবীর যেকোন প্রান্ত থেকে ইন্টারনেট

মাধ্যম কে কাজে লাগিয়ে তার প্রয়োজনীয় ক্লাস করতে পারে এবং চাইলে যেকোন প্রান্ত থেকে যেকোনো অধ্যাপকের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারে। এছাড়া এই E-learning ব্যবস্থায় সময়ের কোন ঘেরাটোপ থাকে না ফলে শিক্ষার্থীরা সময়মতো পড়াশোনার সমগ্র তথ্য হাতের কাছেই পেতে পারে।

২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে আমেরিকাতে একটি সমীক্ষা করে দেখা গেছে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বই খাতা কিনতে প্রায় ১২০০ মার্কিন ডলার খরচ হয়। যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৯০০০০ টাকা, সেখানে ভারতের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মাথাপিছু খরচ প্রায় ৫০০০ - ৩০০০০ টাকা। এক্ষেত্রে E-learning ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা বই ও প্রয়োজনীয় নোটস soft copy হিসেবে পেয়ে যায়। ফলে তাদের খরচে অনেক সাশ্রয় হয়।

E-learning এর আরো একটি বড় সুবিধে হল শিক্ষার্থীরা তাদের বিষয়ের ওপর সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া বা চলতে থাকা ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে পারে। তাছাড়া কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত কোন ব্যক্তি চাইলে তার অসম্পূর্ণ শিক্ষা তার নিজের সুবিধামতো E-learning মাধ্যমকে ব্যবহার করে সম্পূর্ণ করতে পারেন । বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত থাকা এক শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে দেখতে গেলে এই E-learning ব্যবস্থার ইতিবাচক দিকগুলো পাশাপাশি বেশ কিছু নেতিবাচক দিক ও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সাধারণত E-learning প্রযুক্তিটি যথাযথ ব্যবহার করার জন্য কিছু অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ, যেমন একটি ভালো কম্পিউটার বা স্মার্টফোন, ইন্টারনেট সংযোগ, এছাড়াও কিছু আনুষঙ্গিক উপকরণ প্রয়োজন। কিন্তু ১৩০ কোটির দেশে যেখানে আজও প্রায় ১৭ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে, যেখানে ২০ কোটি মানুষের বাড়িতে আজ অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ নেই, যেখানে দেশের বৃহত্তর জনসংখ্যা আজও স্থায়ী কর্মসংস্থানহীন ও রেশন জাতীয় পণ্যের ওপর নির্ভর করেই জীবন অতিবাহিত করে সে জায়গায় দাঁড়িয়ে E-learning প্রযুক্তি আমার মতে সুকান্ত ভট্টাচার্যের মহাজীবন কবিতা অনুসরণে পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি-র মতোই বর্তমান একটা বৃহৎ অংকের মানুষের কাছে।

E-learning ব্যবহার করার জন্য নূন্যতম ইন্টারনেট স্পিড ৮-১০ এমবি/সেকেন্ড হওয়া উচিত, সেখানে ২০১৭ সালে "State Internet Report Akamai Q1" এর সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতের গ্রাম অঞ্চলের দিকে গড় ইন্টারনেট স্পিড ৬.০৫ এমবি/সেকেন্ড যা সাধারণের থেকে অনেকটাই কম, এমনকি ভারতের কিছু এলাকা এলাকায় আজও ইন্টারনেট ব্যবস্থা তেমন ভাবে কার্যকর নয়। ফলে বহু ছাত্র-ছাত্রী আজও এই পরিষেবা থেকে বঞ্চিত।

বর্তমান করোনা আবহে দাঁড়িয়ে ভারতের প্রায় ১২.২ কোটি মানুষ তাদের কর্মসংস্থান হারিয়েছে ফলে বহু বাবা-মা চাইলেও তাদের সামর্থ্য কুলোচ্ছে না তাদের ছেলেমেয়েদের এই পরিষেবার আওতায় নিয়ে আসতে অক্ষম।

সরকার বাহাদুর প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে Virtual Class Room ব্যবস্থা এনেছেন ঠিকই, কিন্তু সঠিক প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষক-এর অভাবে তা ছাত্রদের দ্বারা যথাযথ ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। কোন প্রযুক্তি বাস্তবের মাটিতে স্থাপন করা ভালো, তবে সেটা সঠিকভাবে ব্যবহার হচ্ছে কিনা এবং তা জনজীবনকে উন্নতির পথে এগিয়ে দিচ্ছে কিনা সেদিকেও ওয়াকিবহাল থাকা সরকার বাহাদুরের বিশেষ প্রয়োজন বলে আমার মনে হয়।

শিক্ষা প্রত্যেকেরই জন্মগত অধিকার, তাই সেই শিক্ষা জানো কেবলই পুঁজিপতিদের কুক্ষিগত না হয়ে পড়ে সেদিকেও সরকারকে নজর রাখতে হবে। উন্নত দেশগুলির মত প্রত্যেক গ্রামে বা প্রত্যেক পাড়াতে লাইব্রেরীর পাশাপাশি যদি সরকারি উদ্যোগে সাইবার ক্যাফে বানানো হয়, যেখানে শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে বা কম খরচে E-learning সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করতে পারবে। তাহলে মনে হয় এই সমস্যাগুলি একটা সমাধানের পথ বেরিয়ে আসবে।

শিক্ষা যদি জাতির মেরুদণ্ড হয়ে থাকে তবে সেই মেরুদণ্ডকে রক্ষার দায়িত্ব শুধু বাবা-মায়ের নয় তার পাশাপাশি কিছুটা সরকারের উপরেও বর্তায়। তবে বর্তমানে সরকারি উদ্যোগে ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে ঠিকই কিন্তু কোভিড আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার আরোএকটা দুর্বল দিক আমাদের চিনিয়ে দিয়েছ।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত এক শিক্ষার্থী হিসেবে এটাই চাইবো আগামী দিনে যদি এই সমস্যা গুলোর সমাধান করে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর কাছে E-learning প্রযুক্তিটি যথাযথ ভাবে পৌঁছে দেওয়া যায় তবে যেমন শিক্ষাব্যবস্থার এক আমুল পরিবর্তন আসবে তেমনি বহু ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হবে ।

পরিশেষে একটা কথাই বলতে পারি যে এই মহামারী যেমন আমাদের কাছ থেকে বহু মানুষের প্রাণ, সুখ-শান্তি ও বাঁচার রসদটুকু কেড়ে নিয়েছে ঠিকই তেমনি অনেক নতুন প্রযুক্তির সাথে আমাদের সংযোগ ঘটিয়ে দিয়ে যাচ্ছে যা ভবিষ্যতে অগ্রগতিতে আমাদের আরো এক ধাপ এগিয়ে রখবে।

অভ্র জড়ানো মেঘ

সুমন বেরা
প্রাক্তনী , দর্শন বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক) (শিক্ষাবর্ষ : ২০১১ – ২০১৪)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়
এম. এ. (রৌপ্য পদক), নেট এবং সেট, সিটেট-১, সিটেট-২, এপিএস-পিআরটি কোয়ালিফায়েড

শিরীষ গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।
কাগজের টুকরো হাওয়ায় ভেসে এলো,
মধুভাষ?
জানতে চাইলাম।
আটকে গেল চেতনা মাকড়সার জালে।
ভিন গ্রহের জাল, কঠোর সে বাঁধন।
প্রজাপতি জড়িয়ে ছিল,
উড়ে গেল দু'দন্ড আগে।
চেয়ে দেখি অভ্রজড়ানো মেঘে ভেসে যায়,
পালতোলা তরী।
তীর থেকে দূরে ঐ দিগন্তে....
মহাতল ভেদ করে এগিয়ে চলেছে সে,
গায়ে তার অভ্রআবীর।
চারিদিকে বৃষ্টির জলে,
ধুয়ে গেছে অভ্র।
কেউ যেন বলে গেল,
তরী বেয়ে মাঝি চলেছে সপ্তর্ষিমন্ডলের দিকে।
হাতে তার সুরের বাঁশি।
কুহু রবে ডেকে গেল কত পাখি,
উড়ে যায় প্রজাপতির মতো,
অভ্র জড়ানো মেঘের দিকে।
স্বপ্নের কাগজে পেন্সিল দিয়ে,
হয়ে গেল আঁকা কত শত ছবি !
অভ্র জড়ানো মেঘে চড়ে,
আমি পাড়ি দিলাম স্বপ্নের জগতে।

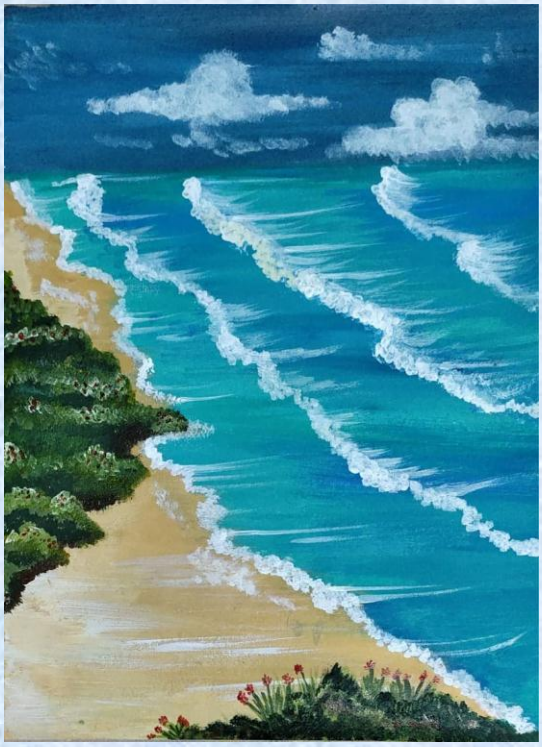

কর্তব্য

সাগরিকা সাঁতরা
দ্বিতীয় সেমেস্টার, বাংলা বিভাগ (স্নাতকোত্তর)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

-নীলিমা.....
-হ্যাঁ মা আসছি।
-কী করছিলি?
-এই যে কলেজে একটা ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হবে,তার জন্য Covid-19 নিয়ে কিছু লেখালেখি করছিলাম। বলো মা কি বলছিলে।
-জানিস, তোর বাবা কাল রাতে হঠাৎ আমায় বলছিল, "জানো, আজ মনটা বেশ খুশি খুশি লাগছে।" আমি জিজ্ঞেস করলাম , "কেন? আজ আবার বিশেষ কি হলো? "তোর বাবা বলল, "আজ বেশ ভালো দুখানা প্রস্তাব পেলাম -আমাদের যে জায়গা টা ভালো দাম না পাওয়ার জন্য বিক্রি হচ্ছিল না, আজ একজন বেশ ভালো দাম দিল।"
নীলিমা খুব আনন্দিত হয়ে মা কে জড়িয়ে ধরে বলল- বাহ্!বেশ ভালোই হল মা। এবার এটা বিক্রি হলেই বড়ো রাস্তার পাশে জায়গাটা কিনেই একটা বড়ো বাড়ি বানিয়ে ওখানেই থাকবো আমরা। তবে দক্ষিণ দিকের দোতলায় একটা বেশ বড়ো আমার মনের মতো রুম করবো মা। ওটা শুধু মাত্র আমার হবে বলে দিলাম। ওহ্ যা হবে না মা!আমার তো ভেবেই আনন্দে মনটা ভরে যাচ্ছে। আর একটা প্রস্তাব কি গো মা? বলো না তাড়াতাড়ি। আমার যে তর সইছে না আর, বলো না মা।
মা মুখে এক প্রশস্ত হাসি নিয়ে বলল-"আমাদের খুকির বিয়ে। রুবি মামা ফোন করে প্রস্তাবটা দিল। ভালো ছেলে, ভালো বাড়ি,টাকা পয়সা ও বেশ ভালোই।"

সূর্যের চমকিত দীপ্ত আভার মতো উজ্জ্বল মুখটি যেন হঠাৎ করে আষাঢ়ের ঘনঘটা কালো মেঘের আড়ালে কোথায় হারিয়ে গেল। ক্ষনকাল মানবরুপী প্রস্তর হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে খুকি ধীরে ধীরে জানতে চাইল-"তুমি কি বলেছো মা?"
-খুকি তো পড়াশোনা করতে চাইছে। জানিনা মাথায় কি ভূত চেপেছে, হাজার বার বললেও সে বিয়ে করতে রাজি নয়।
খুকি বিষন্ন মুখে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল-"আচ্ছা মা, মেয়ে জন্ম দিয়েছো মানেই কি মেয়ের 'বিয়ে' দেওয়াটাই তোমাদের সর্ব বৃহৎ ও সর্ব প্রধান কর্তব্য? তাকে প্রতিষ্ঠিত করে সমাজে উঁচু হয়ে বাঁচার পথ প্রশস্ত করে দেওয়া নয় কেন? আমি কতবার বলেছি মা, এখন আমার বিয়ের সময় নয়; পড়াশোনা করে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়। তাই দয়া করে বারবার বিয়ের কথা শুনিয়ে খোঁচা দিও না আমায়।"
মা রাগান্বিত হয়ে বলল-"হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন কেন, আর কখনোই বিয়ের কথা তুলবো না। তুই আমাদের কাছেই সারাজীবন পড়ে থাকবি।"
নীলিমার চোখে জল এল। ছলছল চোখে নীলিমা বলল-"আমি তোমাদের কাছে 'বোঝা' হয়ে গিয়েছি, তাই না মা? আমায় আর কিছুদিন টেনে নিয়ে যেতে পারছো না তোমরা? তোমাদের কি ইচ্ছে হয় না আমি প্রতিষ্ঠিত হই? আত্মনির্ভরশীল হয়ে বাঁচি? নাকি চাও বাবা যেমন রাতে Drink করে এসে তোমার ওপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করে; আমিও সেই পরিস্থিতির স্বীকার হই?"

মেয়ে মানেই কি Compromise? মেয়ে মানেই কি তার প্রথম এবং প্রধান কাজ বিয়ে, সন্তান ধারণ আর সংসারের সবার সেবা করা? একটা মেয়ের কি কোনো ইচ্ছে বা স্বপ্ন থাকতে পারে না? নাকি মেয়ে হয়ে স্বপ্ন দেখাটা পাপ? নাকি একটা মেয়ের স্বপ্ন গুলো কে বাস্তবায়িত করাটা অপরাধ? যুগ পাল্টাচ্ছে, কিন্তু তোমাদের মানসিকতার কোনো রূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম না মা। কেন মা??

একটা জোরালো ধমক.....
"চুপ কর তুই....."
কড়াইয়ে খুন্তি নাড়ানোর শব্দটা দ্বিগুণ হয়ে গেল। "আজকালকার ছেলেমেয়েদের কাছে বাবা-মায়ের মতামতের কোনো মূল্য নেই। বাড়িতে মেয়ে থাকলে প্রস্তাব আসবেই। তোর বিষয়ে আমরা আর নেই।যা পারিস কর গে যা।"
নীলিমা কিছুটা উগ্র হয়ে বলল, প্রস্তাব আসবে ঠিক; কিন্তু তোমরা কেন সর্বদা আমায় দোহাই দিয়ে এড়িয়ে যাও? তোমরা কি সরাসরি বলতে পারো না-এই তো সবে ২০-২১।এই তো সবে জীবনটা বুঝতে শিখছে। পড়াশোনাতে বেশ মনোযোগ। তাই এখন পড়াশোনা করুক, নিজের পায়ে দাঁড়াক; তারপর না হয়.....
আমায় নিয়ে কি তোমাদের কোনো স্বপ্ন নেই? তোমাদের তো দশ বিশটা সন্তান নেই; একটি মাত্র সন্তান। পাশের বাড়ির সঙ্গীতার বাবা-মাকে দেখে কিছু শেখা উচিত তোমাদের।মেয়ে মাধ্যমিক দিতে না দিতেই তারা প্ল্যান করে রেখেছে কোথায়, কীভাবে,কী পড়লে তাদের মেয়ে ভবিষ্যতে বড়ো হতে পারবে, প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। আর তোমরা.....

মা রক্তবর্ণ চক্ষু সহকারে কালবৈশাখীর বজ্রপাতের মতো এক প্রবল ধমক দিল.....
"চুপ করে যা তুই....."
আর একটাও কথা বলবি না বলে দিলাম। অনেক জ্ঞান শুনলাম তোর।
"হ্যাঁ, তোমার জ্ঞান মনে হবে সব। তোমাদের কাছে মেয়ে মানেই পড়াশোনা করে কি হবে? সেই তো খুন্তি ধরতে হবে। M.A পাশ, B.A পাশ আর ধপাস....."
এই বলে রাগে,দুঃখে, কষ্টে কেঁদে কেঁদে মোবাইলটা নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল নীলিমা।

নীলিমার খুব কাছের বন্ধু আকাশ। খুব ভালো সম্পর্ক ওদের।এহেন জিনিস নেই যেটা দুজন দুজনকে না জানিয়ে করে। নীলিমা এসেই আকাশকে ফোন করল.....
-হ্যাঁ নীলু বল.....
নীলিমা কাঁদতে কাঁদতে বলল-"জানিস আকাশ, আমার সব স্বপ্ন গুলো মনে হয় অন্ধকারে তলিয়ে যাবে রে।"
-কেন রে? কি হয়েছে? ও..... বুঝেছি; আবার বিয়ের প্রস্তাব নিশ্চয়?
-হ্যাঁ রে, আজ মায়ের সাথে এই নিয়ে এক কম্প হয়ে গেল। আর পাশের বাড়ির কাকিমার কি মজা; শুনেই কেমন গান ধরেছে শোন... তুই তো জানিস আমি পরীক্ষার সময়গুলো কীভাবে কাটিয়েছি। বাড়িতে দিনের পর দিন বাবা-মায়ের অশান্তি; যা বিচ্ছেদের পর্যায় পর্যন্ত গিয়েছিল। বাবা রাতে Drink করে বাড়ি ফিরে এসে মায়ের ওপর অত্যাচার করতো। আমি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গেলে অনেক ধমক, ভ্রুকুটিও শুনতে হয়েছে। এমনকি পড়াশোনা

বন্ধ করে দেওয়ারও উপক্রম হয়েছিল। যেখানে সকলে রাত জেগে পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, সেখানে আমি কান্নাকাটি করে রাত কাটিয়েছি। তবুও নিজেকে ঠিক রেখেছি, খারাপ পথে চালিত করিনি। তাও দেখ আজ আমার এই অবস্থা। মাঝে মাঝে খুব কষ্ট হয়। ভাবি অন্য মেয়েদের মতো বাবা-মায়ের মুখে চুনকালি দেবো, না হয় আত্মহত্যা করবো।
-চুপ!এইসব কথা একদম মাথায় আনবি না নীলু।তুই কাঁদিস না রে পাগলি। বড়ো কিছু Achieve করতে গেলে এইরকম অনেক বাধা বিপত্তি আসবে।এই গুলো তো হাসি মুখে কাটিয়ে উঠতে হবে।তা না হলে বড়ো হবি কি করে? এই রকম ভাবে ভেঙে পড়লে হয় নাকি বল। অন্ধকারের পর যেমন সোনালী ভোরের সুমধুর আভা চারদিক আলোকিত করে, তেমনি একদিন তুই ও এই অন্ধকার কাটিয়ে সোনালী ভোরের উজ্জ্বল আলো রূপে ফুটে উঠে সবাইকে রাঙিয়ে দিবি। নিজের ওপর এই ভরসা রাখ। যত বাধা বিপত্তি আসুক একদম ভেঙে পড়বি না বলে দিলাম। আর একদম কান্নাকাটি নয়। আচ্ছা শোন না নীলু, ম্যাগাজিনের জন্য কিছু ভাবলি?
-হ্যাঁ । Covid-19 নিয়ে একটা Article লিখেছি।
-ও বাহ্....আমায় দেখাবি না বুঝি?
-দেখাবো রে। আচ্ছা WhatsApp এ পাঠিয়ে দেবো, দেখে নিস।
-আচ্ছা ঠিক আছে। মন খারাপ করিস না আর। রাখছি রে। Bye....

কিছু বছর পর.....

Sir, May I come in?
Yes, come in. Proud of you নীলিমা! ক্যারিয়ারের শুরুতেই তুমি যেভাবে নারী প্রাচারকারীদের এতোবড়ো একটা গ্যাং কে ধরতে পারলে; Just unbelievable! We are proud of you নীলিমা! এইভাবে আরো ভালো ভালো কাজ করো আর ডিপার্টমেন্টের গর্ব হয়ে ওঠো। Best wishes for you নীলিমা।

আকাশ গরীব বাড়ির ছেলে। অনেক কষ্ট করে একটা কোম্পানিতে কাজ জুটিয়েছে।বেতন ঐ টেনে টুনে দশ থেকে বারো হাজার। আকাশ মনে মনে নীলুকে খুব চাইতো; প্রচুর ভালোবাসতো। কিন্তু সেটা নীলুকে বলার মতো সাহস বা মুখ কিছুই হয়ে ওঠেনি।মনে একটা সুপ্ত ভয়ও ছিল।পাছে তাদের এতো ভালো বন্ধুত্বের সম্পর্ক টা ভেঙে যায়। আর আকাশ এও জানতো যে তার এই ইনকামে নিজের খরচটাই ঠিক ভাবে চলে না; তাতে নীলুর মতো মেয়ের মানিয়ে চলা এক কথায় অসম্ভব।তাই সে নীলুর চাকরির পর নিজেকে অনেকখানি আড়াল করে নিয়েছিল নীলুর থেকে। অবশ্য নতুন কাজে যুক্ত হওয়ার পর নীলুকেও ব্যস্ততা গ্রাস করে। ফলে তাদের মধ্যে অনেকটাই দূরত্ব তৈরি হয়।

আকাশ তাড়াতাড়ি করে অফিস থেকে বেরিয়েই নীলুকে ফোন করল.....
-কী রে নীলু, Busy নাকি খুব?
-না না, Busy নয় রে। বল.....
তুই কি করলি নীলু! নিউজে IPS নীলিমা কে বারবার দেখছি আর ভাবছি--এটাই কি সেই

কিছু বছর আগের নীলু, যে দুই আঁখি ভরা বৃষ্টির ধারা নিয়ে আমার কাছে আসতো! সেই নীলু-ই কি আজকের IPS নীলিমা চৌধুরী!!

নীলিমা মৃদু হেসে বলল- না রে, এটা আকাশের সৃষ্টি করা এক নতুন "নীলিমা"। যে নীলিমাকে সেদিন ভাঙতে না দিয়ে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলি, সব অন্ধকার দূর করে সেই নীলিমা-ই আজ IPS নীলিমা চৌধুরী রূপে তোর দেখানো সোনালী ভোরের আলো হয়ে ফুটে উঠেছে। যাক গে,তুই এখন আসতে পারবি একটু?
-অবশ্যই।কোথায় যেতে হবে বল?
-আমাদের সেই পুরোনো কালী মন্দিরে.....
-আচ্ছা; এখুনি আসছি.....

টুং টুং করে কলিং বেল বেজে উঠল।দরজা খুলতেই এক সিঁথি লাল টকটকে উজ্জ্বল সিন্দুর আর একরাশ তৃপ্তিপূর্ণ হাসি নিয়ে দু-জোড়া হাত পা স্পর্শ করল।
-"মা, আমায় ক্ষমা করো। তোমায় সেদিনের এই উপহারটি দিতে দেরি করলাম।"

মা বাকরুদ্ধ! মনের মধ্যে যেন এক অপরাধবোধ জেগে উঠল। অতীতে মেয়ের স্বপ্ন ভঙ্গকারী সিদ্ধান্ত গুলো যেন বারবার মনের মণিকোঠায় খোঁচা দিয়ে দিয়ে অপরাধ বোধের মাত্রাকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলল। চারিদিক যেন ঘন কুয়াশার মতো এক প্রবল নিঃস্তব্ধতার মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে গেল।

মা তার 'খুকি'-র পানে চেয়ে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আর দুচোখ ভরে অন্তহীন ভাবে বয়ে চলে অশ্রু গঙ্গা। হয়তো এই অশ্রু বারি ই হাজার হাজার বাবা-মায়ের কাছে বার্তা দিয়ে যায়; মেয়ের প্রতি বাবা-মায়ের আসল "কর্তব্য"!!

জীবনযুদ্ধ

সরস্বতী বেরা
চতুর্থ সেমেস্টার, ইংরেজি বিভাগ (স্নাতকোত্তর)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

জীবন মানে ভাঙা-গড়া, জীবন মানে প্রাণের আধার ;
পৃথিবীটা এক নাট্যমঞ্চ, বিধাতা একাই নাট্যকার ।
রং-বেরং-এর সমারোহ, তবুও মোদের জীবন জারি ;
বিশ্বব্যাপী মারণখেলায়, বেঁচে থাকাটা খুব জরুরি ।

ধরণী এখন বেজায় অসুখে, নিঃশব্দে ঘোরে অন্ত-ধ্বনি ;
দূষণ বাড়ছে মানবিকতার, পবিত্র গঙ্গা শব-বাহিনী ।
আকাশ-বাতাস-মাটির বুকে, বিশ্ব-সমাজ অসহায় ;
মৃত্যু হাসে অট্টহাসি, লাশগুলো সব ভেসে যায় ।

বেহিসাবী মৃত্যুমিছিলে, জীবন হারায় বাক্য ক্রমে ;
আগামীর আশার বার্তা, ঢাকা পড়েছে কালোবাজারির নামে ।
সবুজ রং-এর ফিকে আভায়, রুদ্ধশ্বাসে কাটছে দিন ;
অসহ্য স্তব্ধতা তাই, মুক্তির কাছে অর্থহীন ।

বিভীষিকার আতঙ্কে কাঁদে হাজারও খুশির ক্ষত ;
শ্বাস-প্রশ্বাসে ক্লান্তি মিশে, হানছে আঘাত কত শত ।
অদৃশ্য শত্রুর আক্রমণে, ভাঙছে আকাশ কোলাহলে ;
নতুন আলোর অগ্নিশিখা, দীপ্তশিখায় উঠুক জ্বলে ।

দুঃসময়ের ঘোর অমানিশা, হোকনা যতই কালো ;
বিদায় নেবে অবশেষে, ফুটবে আশার আলো ।
দূর্বিপাকের অধীনে মোরা থাকবো না তো চিরন্তন;
জীবনযুদ্ধে জয়ী হবো, এটাই মোদের দৃঢ় পণ।

কথা দিলাম

সেক নাসিম মহম্মদ
চতুর্থ সেমেস্টার, দর্শন বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

পাখিরা সব যাচ্ছে উড়ে শহর থেকে দূরে,
কে আর তবে গান শোনাবে মিষ্টি মধুর সুরে?
ছোট্ট বাবান জানালা দিয়ে ডাকছে, "পাখি আয় না ---"
ডাক শুনে তার থমকে দাঁড়ায় মনমরা এক ময়না ।
চোখ ছলছল বাবান তাকে শুধায় কাছে ডেকে,
"তোমায় ছাড়া প্রাণটা আমার কেমন করে বাঁচে?"
ময়না বলে, "সাধ করে কি দিচ্ছি দূরে পাড়ি!
গাছগুলো সব পড়ছে কাটা, উঠছে বিরাট বাড়ি।
লাগাও যদি গাছের চারা সারা শহর ঘিরে,
কথা দিলাম তোমায় আমি আসবো আবার ফিরে।"

আমাদের কথা

সৌরাশিষ রাউৎ
প্রাক্তনী, বাণিজ্য বিভাগ (স্নাতকোত্তর, নেট কোয়ালিফায়েড)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

তোমরা কত বড় মানুষ
কতই যে করো মান,
নেই আমাদের কোনো সম্মান
শুধুই অপমান ।

নেই আমাদের কোনো ইতিহাস
নেই যে ভবিষ্যৎ ,
গর্ব আমাদের শুধু এটাই
আমরা বড়ই সৎ ।

নেই গরীবের কোনো মান
নেই তো সঠিক মূল্য,
তাই তো আমরা খেটে খাওয়া শ্রমিক
দাসানুদাসের তুল্য ।

তোমরা আমাদের করছ ঘৃণা
যাবে নাকো কভু ভুলে,
আমরাই যে সমাজ গড়ি
শ্রম দিয়ে তিলে তিলে।

মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু হলো বই

সুদীপ্তা মান্না
ষষ্ঠ সেমেস্টার, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

"জ্ঞান ভান্ডারেরে চাবিকাঠি সে তো বই। সুখে-দুঃখে জীবনের সাথী আর আছে কই?"

পল্লী কবি জসিমউদ্দিন বলেছেন, "বই জ্ঞানের প্রতীক, বই আনন্দের প্রতীক।" মানব জীবনে সবচেয়ে বড়ো সম্পদ বই। বই পড়েই মানুষ অজানাকে জানতে পারে, অচেনাকে চিনতে পারে। জ্ঞানের প্রসারের ক্ষেত্রে বই হলো একটি বড়ো মাধ্যম। শিক্ষিত মানুষের বেঁচে থাকার অন্যতম রসদ হলো বই। তাই ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জার্মানি প্রভৃতি স্থানে প্রতি বছর জাতীয় মেলার অঙ্গ-স্বরুপ বই-এর প্রদর্শনী বসে। বই হলো আয়নার মতো, যাতে আমাদের মনের প্রতিবিম্ব ধরা পরে। বিদ্যার্থীর্দের প্রতি দেবী সরস্বতীর দুটি প্রধান দান-বীণা ও পুস্তক। বীণা অর্থাৎ সুর ও গান, যা মানুষের অন্তর এবং বাইরের সঙ্গী আর বই তার চিন্তা, আবেগ, বোধের অপরিহার্য দিগ্‌দর্শন। বই পড়া সর্ব কালের সব দেশের মানুষের শখ। মনের সুস্থতার ওপর অনেককাংশে দেহের সুস্থতা নির্ভরশীল। মনকে সুস্থ রাখতে ভালো বই-এর প্রয়োজন। মানুষের জীবনের চলার পথে যেমন ভালো বন্ধুর প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন ভালো বই। বইকে যে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে তার শত্রু অনেক কম। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে, ‘ধনবানে কেনে বই, গুণবানে পড়ে।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "মানুষ বই দিয়ে অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সাঁকো বেঁধে দিয়েছে।" ভিক্টর হুগো বলেছেন,"বই বিশ্বাসের অঙ্গ, বই মানব সমাজ কে সভ্যতা টিকিয়ে রাখার জ্ঞান দান করে। অতএব বই হচ্ছে সভ্যতার রক্ষা কবচ।" বই কেনা যেমন নেশা তেমনি বই পড়া ও নেশা। যে প্রকৃত গুণবান, সে অনেক সময় নিজেকে নিঃস্ব করে বই কেনে। বই এর মাধ্যমে বিশ্ব মানব এর সঙ্গে যোগ ঘটে। তাই আমাদের কে বই পড়তে হবে। সব মিলিয়ে বই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু - এ কথা বলাই যায়।

Destiny

Debabrata Utthasini
Ex-student, Department of English (Post Graduate)
Pingla Thana Mahavidyalaya

O Destiny, let thee be seen.
Thou art irrevocable.
Is it not so mean?
And all thou leave: some incapable !

Really, how strange thee are!
Ye, a pretence,
Ye, a rough shower;
Have no reverence.

Let me see
Please be slow,
Allow to be free.

Destiny, you’re the utmost truth,
Me thee make a booth.

মধ্যবিত্ত

মিতালী ভৌমিক
চতুর্থ সেমেস্টার, দর্শন বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

হ্যাঁ, আমরা মধ্যবিত্ত - খাচ্ছি, ঘুরছি, বেড়াচ্ছি
আর নিজের স্বপ্নগুলোকে মারছি।
যখন কোনো বড় স্বপ্ন দেখতে যাবো,
বড়ো লোকরা বলে, এরা কারা!
এ পৃথিবী স্বপ্ন নয়, টাকায় মোড়া।
যার কাছে টাকা আছে, তার কাছে সম্মান,
আর যার কাছে টাকা নেই, সে পাবে অপমান।
সিনেমা দেখতে গেলে হিরোদের
মধ্যে নিজেদের হিরো মনে হয়;
আর সিনেমা শেষ হলে,
এটা তো স্বপ্ন ছিলো, এটা কোনো সত্য নয়।
ওরা চড়বে গাড়ি, থাকবে ঘরে A.C!
আমি না হয় ড্রাইভার হবো, তাতেও আমি খুশি।।
প্রেমের আকাশে পুরোটাই ফাঁকা,
তারা গুলো সব মেঘে ঢাকা,
মনে যার ছবি আঁকা,
হয় সে বিলুপ্ত,
কারণ, আমরা মধবিত্ত।

ছেলেবেলা

অর্ঘ্য ভট্টাচার্য্য
ষষ্ঠ সেমেস্টার, কলা বিভাগ (স্নাতক, সাধারণ)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

ছেলেবেলা ভাল ছিল,
আজও পড়ে মনে।
আজও তার স্মৃতিগুলো নাড়া দেয় প্রাণে।
খেলাধুলো, দুষ্টুমিতে ভরা ছিল দিন,
আজও মোর স্মৃতিতে হয়নি তা ক্ষীণ।
নিষ্পাপ দিনগুলো কোথা গেল আজ,
বয়সের সাথে সাথে বেড়ে গেছে কাজ।
খেলাবাটি খেলনায় মজা হত রোজ,
আজও তাই মনটা যে করে তার খোঁজ।
হুটোপুটি, আনন্দে মজা হত রোজ,
আজও আমি ঘুরেফিরে করি তার খোঁজ।

সুখ

অরিন্দম ভট্টাচার্য
চতুর্থ সেমেস্টার, ইংরেজি বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

সুখের স্থায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে যদি আমরা একে আপেক্ষিকের তকমা দিই, মনে হয় না খুব একটা ভুল হবে,কারণ এই সুখ প্রত্যেক মানুষের চাহিদা মোতাবেক বিভন্ন বস্তুর ওপর নির্ভরশীল। কেউ ৫০০টাকা দক্ষিণা দিয়ে ২ ঘন্টা লাইনে দড়িয়ে এক বিগ্রহের উপর দুধ-ফল দিয়ে নিজকে সুখী পূর্নাত্মা মনে করে, অপর দিকে একজন নিজের ক্ষুধা নিবারণের আশায় রেস্টুরেন্টগুলোর বাইরে থাকা ডাস্টবিন গুলো হাতড়ে মরে আর ভাবে এবেলা যদি পেটটা ভরাতে পারি তাহলে আমার থেকে সুখী আর কেউ হবেনা।

বর্তমান সভ্যতার বুকে দাঁড়িয়ে এটা বলা সত্যিই কঠিন যে আমরা ঠিক কতটা সুখী! না, সবার সামনে নয়, নিরিবিলিতে নিজেকেই প্রশ্ন করুন, আপনার মনই সঠিক উত্তরটা দেবে। বাস্তবে সুখ কী? আমায় প্রশ্ন করলে আমি শুধু এতটুকুই বলতে পারি ভগবান প্রদত্ত ক্ষুদ্র ধারনশীল মস্তিষ্কের অধিকারি হেতু আমার কাছে এ উত্তরটা না থাকাটাই স্বাভাবিক। দেখা যাক অনামিকা ও আশিষের মতে প্রকৃত সুখ কী?

বাঁকুড়া জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রাম শিমুলফুলি। মোটের ওপর গ্রামটা যে খুব বড়ো তা নয়, তবে গ্রামের যতদূর চোখ যায়, এতটুকু বোঝা যায় যে সৃষ্টিকর্তা যেন খুব ধৈর্য নিয়ে নিপুণ তুলির টানে এই স্বপ্নলোকের সৃষ্টি করেছেন। গোটা গ্রাম ঘিরে রয়েছে বট, মহুয়া, দেবদারু গাছের প্রকান্ড প্রাচীর। সৃষ্টিকর্তা যেন তাঁর সৃষ্টিতে এতটুকু খুঁত রাখতে নারাজ, তাই গ্রামটির সৌন্দর্য আরো একটু বাড়িয়ে দিয়ে গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলছে কেশবতি মেয়ের চুলের বিনুনির ন্যায় একচলিতে ছোট নদী গন্ধেশ্বরী। আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়ার সাক্ষী হিসাবে দাড়িয়ে রয়েছে কয়েকটা গ্যাসবাতির পোষ্ট আর গ্রামের পাশে সবুজ প্রান্তরের বুক চিড়ে সুদূর শহরের দিকে চলে যাওয়া একটি সড়ক পথ। এই গ্রামেরই একপ্রান্তে জনার্দন তার পরিবার নিয়ে পৈত্রিক ভিটেতে বসবাস করে আর যেটুকু জলাজমি আছে তাতে চাষাবাদ করে মোটা ভাত মোটাকাপড়ে স্বাচ্ছন্দে দিনযাপন করে।পরিবার বলতে আছে তার স্ত্রী মনিকুন্তলা, বছর চব্বিশের ছেলে আশিষ ও চারটে হালের গরু। চাষের সময় গরুগুলোর ওপর দিয়ে খুব ধকল যায়, তাই চাষ থেকে উঠলে আশিষ ওদের নিয়ে যায় নদীর পাড়ে।এবারে সদ্য ধান ঘরে উঠেছে, আর ফলনটাও ভালোই হয়েছে, নিয়ম করে প্রত্যেকদিন আশিষ গরুগুলোকে নিয়ে বেরত। তেমনই একদিন নদীপাড়ে গরুগুলোকে ছেড়ে দিয়ে একটি বটগাছের নীচে বসে কোমরে গোঁজা বাঁশের বাঁশিটা বের করে আপন মনে বাজাতে লাগল আশিষ। বলে রাখা ভালো আশিষ বাঁশিটা মন্দবাজায় না, জলের কলতান আর আশিষের বাঁশির সুর মিলেমিশে এমন এক আবহ সৃষ্টি করল, যেন মনে হয় বহুকালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বটগাছের নিঃসঙ্গতা কাটানোর চেষ্টা। সময়ের প্রবাহে পূর্বের সূর্য সারাদিনের পারিশ্রমের পর ধীরে ধীরে ক্লান্ত শরীরটাকে এলিয়ে দিচ্ছে পশ্চিম দিগন্তে, এমন

সময় হঠাৎ চেনা সুরগুলোর মাঝে এক অচেনা ছন্দ এসে কানে বাজল। আশিষ পেছনে তাকিয়ে দেখে একটা মেয়ে তার অজান্তে নদী থেকে জল নিয়ে পাশের মেঠো পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, আর থেকে থেকে উৎসুখ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তার দিকে। আশিষ বিস্মিত হলেও সে ভাবল গ্রামের আর পাঁচটা মেয়ে বউয়েরই মত নদীতে জল আনতে এসেছে।পরের দিনও যখন আশিষ গাছতলায় বসে, ও লক্ষ্য করল গতদিনের সেই দুটি চোখ আজও ওর দিকে তাকিয়ে আছে। সেই দিন আশিষ ভালো করে লক্ষ্য করল তাকে। আঠারো-উনিশ বছরের এক অপরুপ সুন্দরী মেয়ে, সবথেকে অদ্ভুত তার চোখের অপলক দৃষ্টি। হাজার হোক আশিষও আর পাঁচটা মানুষের মতো রক্ত মাংসে গড়া আবেগভরা যুবক, মেয়েটা তারপর নিজে থেকেই আশিষের দিকে এগিয়ে এসে বলল,

-বাঃ বেশ বাঁশি বাজাও তো তুমি! আমার খুব ভালো লাগে। নাম কী তোমার ?

স্বভাবে বেশ লাজুক আশিষ মুখ নিচু করে শুধু উত্তর দিল,

-আ-আ- আশিষ। তোমার?

মেয়েটি মুচকি হেসে বলল, অনামিকা। গ্রামের পূর্বে শ্যামাচরণ অধিকারীর মেয়ে।

আশিষ নামটি শুনেছে।

এই ভাবে প্রত্যেকদিন আশিষ বাঁশি বাজাত আর অনামিকা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনত। আস্তে আস্তে তাদের ক্ষণিকের পরিচয় গড়িয়ে চলল একটা পরিণতির দিকে। একসময় এমন হল আশিষের জগৎ বলতে অনামিকা আর অনামিকার আশিষ। যেন তারা একই পয়সার এপিঠ-ওপিঠ। আশিষ ভাবত ও নিজে হাতে অনামিকাকে কিছু দেবে কিন্তু সামর্থ পথ আটকে দাঁড়াত। অনামিকা সব বুঝলেও সে আশিষকে কখনোই কিছু বুঝতে দিত না। এমনই একদিন অনামিকা চলে যাওয়ার পর বিষন্ন মনে নদীর দিকে তাকিয়ে বসে ছিল আশিষ। হঠাৎ কিছুদূরে সড়কের দিক থেকে এক প্রকান্ড শব্দ পেয়ে সে ছুটে গেল।একটা গাড়ির দুর্ঘটনা ঘটেছে, গাড়ির যাত্রীরা আর কেউ বেঁচে নেই। আর এও দেখল যাত্রীদের শরীরে অনেক গয়না। বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের মতো একটা বুদ্ধি খেলে গেল আশিষের। সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত হাতে কোমরের গামছাটা মাটিতে পেতে গয়নাগুলোকে একটা পুটলি করে সন্তর্পণে বাড়ির দিকে দৌড় দিল। এই সমস্ত গয়না সে অনামিকাকে উপহার দেবে ভেবে খুব খুশি হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু একটা অজানা ভয় তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছিল ‘কেউ দেখে ফেলেনি তো তাকে’ ? আনন্দ ও আতঙ্কের টানাপোড়নে গোটা রাত ঘুম হলো না তার। সেদিন অনামিকা আগেই চলে এসেছিল, আশিষ এলো কিছু পরে। প্রথমটায় আশিষকে দেখে থমকে গিয়েছিল অনামিকা, চুল উস্কোখুস্কো, অনিদ্রায় চোখ কোটরে বসে গেছে, মুখে ফুটে উঠেছে আনন্দ ও আতঙ্কের মিশ্রভাব।

আশপাশটা একবার ভালো করে দেখেনিয়ে পুটলিটা অনামিকার সামনে রেখে বলল ‘এ-সব তোমার’।

অনামিকার চোখ প্রায় কপালে উঠল, কিন্তু ওতো আর পাঁচটা মেয়ের মত নয়।ও জিজ্ঞাসা করল,

-‘সত্যি করে বলো এগুলো কোথায় পেলে’?

সঙ্গে সঙ্গে আশিষের মুখের হাসিটা মিলিয়ে গেল। নেকড়ের মতো দাঁতে দাঁত চেপে হিংস্র ভাবে ঝাঁঝিয়ে উঠল,

-'কোথায় পেলাম এতসব জেনে তোমার কি লাভ, সব কৈফিয়ত কি তোমাকে দিতে হবে'।

এতদিনের চেনা আশিষকে আজ বড্ড অচেনা লাগছে অনামিকার, তার চোখের কোণে জল। কিন্তু হায়! আশিষের অত সবে আর ভ্রুক্ষেপ নেই, সে জোর করে একটা বালা অনামিকার হাতে পরাতে যাচ্ছিল। এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল অনামিকা, শুধু যাওয়ার সময় একবার আশিষের দিকে তাকিয়ে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল,
-'আমি তোমার সামর্থকে নয়, তোমাকে ভালোবেসেছিলাম'।

আশিষ প্রথমটায় কিছু বুঝতে পারেনি, যখন বুঝল অনেক দেরি হয়ে গেছে। যার সুখের কথা ভেবে সে এসব করল, আজ সেই অনামিকাই তাকে ছেড়ে চলে গেল। কাল পযর্ন্ত যখন সে নিঃস্ব ছিল, তখন যে মেয়ে তার হাত রেখে বলেছিল পাশে থাকবে, কিন্তু আজ? যার চোখে জল আসতে দেবে না বলে আশিষ নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল, আজ সেই অনামিকার চোখের জলের কারণ কেবল সে-ই। সে সোনার বিনিময়ে সুখের সওদা করতে চয়েছিল, কিন্তু তার পরিণতি এই। তখন সে জীবনের রুঢ় বাস্তবটা উপলব্ধি করল।

'কোনো পার্থিব সম্পত্তি মানুষকে সাময়িক সুখের আঙিনায় নিয়ে গেলেও সে কেবলই মরীচিকা। পরস্পরের সম্পর্কে বিশ্বাস আর ভালোবাসাই পারে মানুষকে প্রকৃত সুখ দিতে'।

এবার সত্যিই নিজের কৃতকর্মের প্রতি ঘৃণা হচ্ছিল তার। পায়ের কাছে পড়ে থাকা গয়নার পুটলিটা হাতে নিয়ে মনে মনে বলল, এসবের জন্য এ-ই দায়ী, বলে সজোরে ছুঁড়ে দিল নদীর জলে।

অনেক দিন কেটে গেছে, অনামিকা আর আসে না, আশিষ তবুও রোজ গাছের নীচে বসে ফেলে আসা দিনগুলির কথাভাবে আর আপনমনে বাঁশি বাজায়। এমনি একদিন বাঁশির সুরের সাথে এক অতি পরিচিত শব্দ, পেছনে ফিরতেই দেখে পড়ন্ত বিকেলের রক্তিম আভা গায়ে মেখে কিছু দূরে দড়িয়ে এক নারীমূর্তী। আশিষ কিছু বলার আগে সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে সে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরল তাকে। তার বুকে মুখ গুঁজে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে অনামিকা আর বলছে,
-'এইতো আমার চেনা আশিষ, কোথায় হারিয়ে গেছিলে'। আশিষেরও চোখে জলবিন্দু ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়তে থাকল অনামিকার মাথার ওপর, ও শুধু বলল- 'ক্ষমা করে দাও'।

আমার মা

সেক নাসিম মহম্মদ
চতুর্থ সেমেস্টার, দর্শন বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

প্রথম স্পর্শ তোমারই যে গো মা,
প্রথম শব্দ তুমি,
তুমিই আমার জগৎ মাগো
জন্মদাত্রী মা ....

" মা, মাগো মা,
আমি এলাম তোমার কোলে!
তোমার ছায়ায়, তোমার মায়ায়
মানুষ হবো বলে।"

হলুদ মাখা হাত দুখানি,
ঘামে ভেজা মুখ,
তোমার আঁচল গায়ে জড়িয়ে
আমার যতো সুখ।

তোমার শাড়ির আঁচল মাগো
আমার মাথার ছায়া;
তুমি আমার অমূল্যধন,
সবচেয়ে দামী পাওয়া ।

তুমি ছাড়া কে নিত মোর
জন্ম যন্ত্রণা?
তোমার নামে কি লিখি গো মা
আমি তো তোমারই লেখা।

বাড়ি

সৌরভ দাস
চতুর্থ সেমেস্টার, দর্শন বিভাগ বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

আমার নাম সৌরভ দাস। আমি পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়-এর দর্শন বিভাগের ছাত্র। আমার হাতের কাজ বানাতে খুবই ভালো লাগে। তাই আমি আজ ই-পত্রিকার জন্য কাঠ কাগজের তৈরি একটি বাড়ি বানিয়েছি। এটি বাড়িতে সাজিয়ে রাখার জন্য। এটি বাড়ির সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করবে।

যে সব উপকরণ আমার লেগেছে তা হল বাড়ির কিছু অপ্রয়োজনীয় জিনিস। এটি বানাতে আমার যে সব উপকরণ লেগেছে তা হল-

1) কাঠ কাগজ, 2) একটি কাঁচের শিশির, 3) রং, 4) ইলেকট্রিক চিট, 5) কাঁচি, 6) তুলি ইত্যাদি।

এই মাপের দুটো কাঠ কাগজ কাটতে হবে।

এই মাপের দুটো কাঠ কাগজ কাটতে হবে।

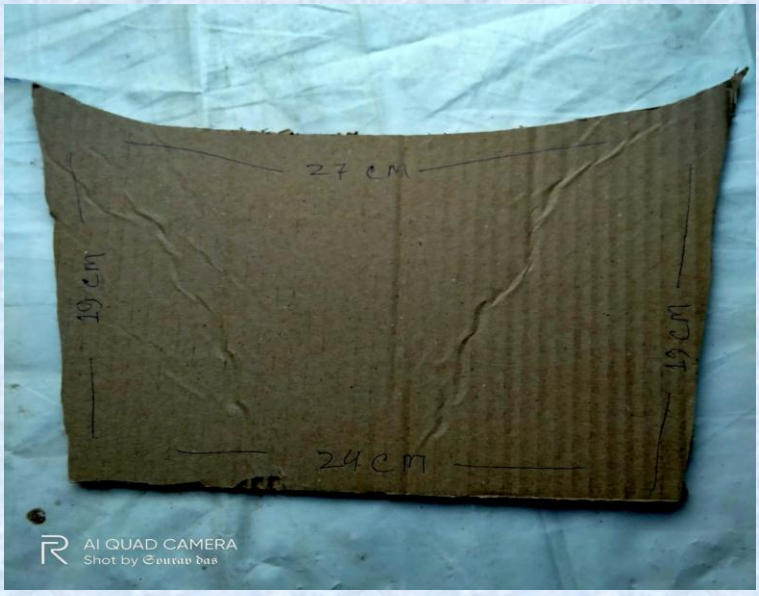

এই মাপের দুটো কাঠ কাগজ কাটতে হবে।

এই মাপের (1cm/2cm) বেশ অনেকগুলো কাঠ কাগজ কাটতে হবে।

শিশির দুই জায়গায় এই ভাবে টুকরো কাগজ লাগিয়ে নিতে হবে।

এই ওপরের শিরা বরাবর এই ধরনের টুকরো কাগজগুলো বসিয়ে নিতে হবে।

এই মাপের (এই ভাবে গোল) কিছু কাঠ কাগজ কাটতে হবে।

এরপর হালকা সবুজ রং দিতে হবে।

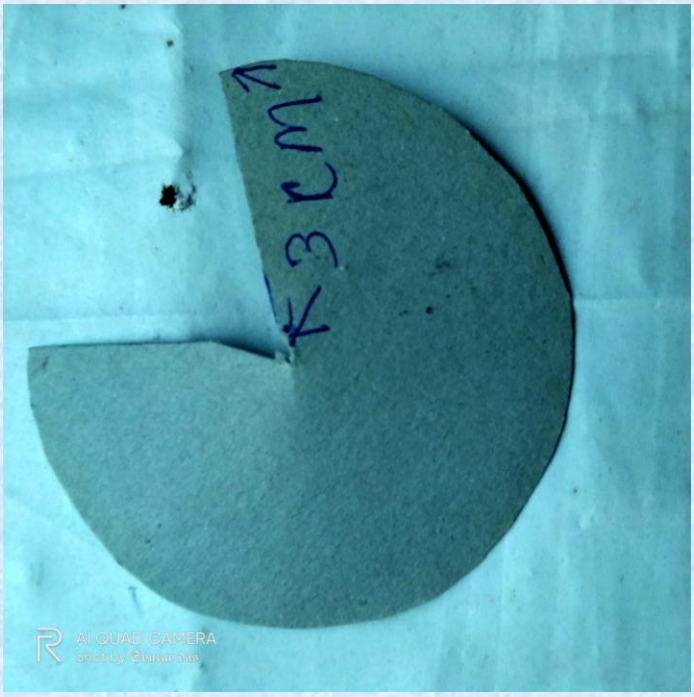

এই মাপের (3cmব্যাসার্ধ)একটি কাঠ কাগজ কাটতে হবে।

এই মাপের একটি কাঠ কাগজ কাটতে হবে।

এর পর ঘরের চাল বানিয়ে নিতে হবে।

এই মাপের (1cm/4cm) কিছু কাঠ কাগজ কাটতে হবে।

এটি একটি দরজার মাপের কাঠ কাগজ কেটে বানিয়ে নিতে হবে।

গোটা চাল বরাবর এই টুকরো (1cm/2cm) গুলো এই ভাবে বসিয়ে নিতে হবে।

এই মাপের একটি কাঠ কাগজ কাটতে হবে।

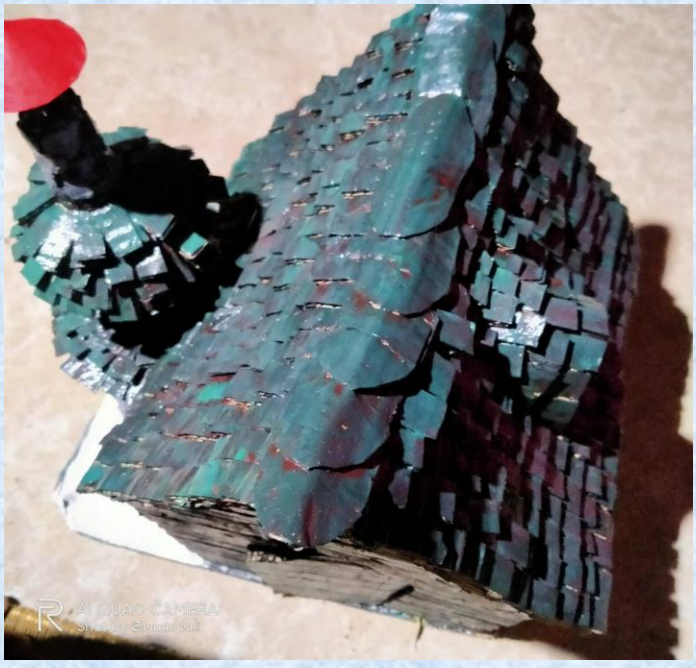

পুরো চাল বরাবর ডিপ সবুজ রং দিতে হবে।

সামনে এই টুকরো (1cm/4cm) চিট দিয়ে বসিয়ে নিতে হবে।

প্রথমে ঘরটির দেওয়াল এর জন্য এই ভাবে চিট দিয়ে নিতে হবে।

প্রথমে পুরো চাল বরাবর এই রং(কালো+লাল) দিতে হবে।আর শিশির এর ফাঁকা অংশ ও দেওয়ালে কালো রং দিতে হবে।

সামনে বাদামী রং দিতে হবে।ও শিশির এর কালো রং এর ওপর (কালো+সাদা) রং দিতে হবে। দরজা তে ডিপ নিল দিতে হবে।

কিছু অপ্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে তৈরি এই বাড়িটি ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে।

শ্রাবণ

সুমন্ত মিশ্র
চতুর্থ সেমেস্টার, দর্শন বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

বৃষ্টি ফোঁটায় প্রেমের সুবাস মিষ্টি মুখে হাসে,
নিঝুম কালো মেঘের দল আকাশ কোলে ভাসে।
কদম ভরা গাছের ডালে মন কেমনের সুর,
মেঘলা দিনে একলা মন যাচ্ছে অনেক দূর।
কাজল আঁকা চোখের পাতায় অশ্রু জলের ধারা,
ফুলকলিরা ওলির পানে প্রেমে পাগল পারা।
শ্রাবণ জলে দুষ্টু মন কবিতা হয়ে ভাসে,
খেয়াল সুবে বারে বারে প্রেমের গান আসে।
কামিনী ফুলের গন্ধ সারা আকাশ জুড়ে ছোটে,
সবুজ ঘাসে আদর মাখে লাল গোলাপে ঠোঁটে।
কেয়া পাতার নৌকো জোড়া নেচে নেচে চলে,
শাপলা ফুল হাতছানি দেয় মেঠো জলের কোলে।
বৃষ্টি খুশি শ্রাবণ পেলে ঘুমো হাসির রেখা,
রবিব কোলে পাহাড় তলে রামধনুকের দেখা ।

রক্তের বন্ধন

সুস্মিতা সামন্ত
দ্বিতীয় সেমেস্টার, কলা বিভাগ (স্নাতক, সাধারণ)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

আমরা সবাই এসেছি এই সুন্দর পৃথিবীতে,
বেঁধেছি মোরা সকলকে সৌভ্রাতৃত্বে।
কেউ আমরা ভিন্ন নয়, এক ঈশ্বরের সৃষ্টি ,
কারো দুঃখে দুঃখ পেলে চোখে নামে বৃষ্টি ।
সকলেরই রক্ত লাল নয়তো কারো ভিন্ন ,
খিদে পেলে সবাইতো চাই এক মুঠো অন্ন !
বিপদে কেউ পড়লে মোরা থাকি না তো বসে,
এক ছুটে গিয়ে দাঁড়াই তাদেরই পাশে।
তাদের দুঃখ ভাগ করে নিই মোরা সকলে ,
তাদের সঙ্গে মোদের রক্তের বন্ধন আছে বলে!

Scientific Sensibility in time of Novel Corona Virus

Subhasis Mandal
Ex-student, Department of English (Post Graduate)
Pingla Thana Mahavidyalaya

Almost one and a half years have passed, still we can't overcome this corona boredom, still we don't get relief from the clutches of Corona pandemic. It now arises a horrible question in the minds of human beings that what will be the future of human civilization! Covid-19 is regarded a curse on human civilization. Though according to some intellectuals, Covid-19 has too a learning process; to them, it is a blessing as it decreases the environment pollution as well as it imparts peace to such people who were utterly busy from dawn to dusk before the emergence of this Novel corona Virus. It is like science which has bless and curse as well. The Covid-19 pandemic has brought to the fore the importance of a thriving scientific ecosystem for dealing with global crises. We are using masks in order to protect ourselves from the attack of this virus. Really it is a thought provoking matter to us that Covid-19 has stated as an obstinate mask on the mouth of human civilization and through which it cannot breathe well. Scientific sensibility is very important in order to protect ourselves from this ruthless virus as the entire world was waiting for corona vaccine and it is worth noting that science can only bring that miracle. In the diverse social structure that characterizes India, misbelieves and superstitions are still as active as in earlier days. Social media in particular has been swamped by hundreds of beliefs and superstitions during the COVID-19 pandemic, primarily 'infecting' digitally literate people who are unable to check the fake and unthinkingly passing on suspect messages going viral. Common people in general have been found wanting in responding to calls for greater awareness and necessary behavioural change towards adopting safe practices. Mainstream media in India has been largely playing its role in educating people about the pandemic and thereby contributing towards inculcating scientific temper, but more needs to be done. Five highly circulated superstitions and misbeliefs on social media about the corona virus have figured in this observation, while public awareness campaigns like 'hoax busters' by Indian Scientists.

Response to Covid-19 (ASRC) and 'Infodemic vis-a-vis Pandemic' by Dr. Anamika Ray Memorial Trust (ARMT) has been highlighted as the sort of responses that can be mounted to counter misinformation and superstitions.

superstitions.

In the book “Superstition: Belief in the Age of Science”, author Robert L. Park (2008) explained the concept of faith and superstition: “…scientists use the word “faith” to express their confidence that the laws of nature will prevail, beginning with the law of cause and effect. The religious use of “faith” implies belief in a higher power that makes things happen independently a physical cause. This defines superstition. The two meanings of “faith” are thus not only different, they are exact opposites”. As the author makes it clear here, faith has two meanings and these are exactly opposite.

Although various superstitions are discernible rather viral in various social media platforms on Covid-19.We can note few instances in this respect. In the pre-lockdown period, particularly mentioning on the tenth day of first phase of nationwide lockdown, our prime minister Shri Narendra Modi addressed the country in a short video message at 9 pm. He requested the citizens to turn off lights for 9 minutes at 9 pm on April 5 and light a candle/earthen lamp/torch or the flashlight on mobile phones to mark the country's fight against COVID-19 (ET Online, 2020). The Prime Minister's message was about making a gesture of gratitude to corona virus warriors and give them mental strength during the crisis. Such a move would also remind people they are not alone, and thereby help mitigate the sense of isolation a lockdown brings. But many people reacted on social media by arguing that lighting lamps is a very good gesture, because it creates an 'ethereal aura' that is very calming and effective — which is but a belief.

Many people also discovered a significance in the number 9. They sought to explain it 'scientifically' but ended up purveying superstition — about the timing of the PM's address at 9 am, his exhortation to the people to light lamps or flash light for 9 minutes at 9 pm on April 5 (5th day+ 4th month = 9), the address made after 9 days of beginning of lockdown, 9 days left from April 5th, 9 Planets, No. 9 = Mars (Mangal — the Planet of Light & Fire). There are a lot of nines in this paragraph, even for a coincidence! A former Head of the Indian Medical Association took to social media to “explain the science” behind the Prime Minister’s announcement – “…[the announcement] is based on Yoga Vasistha, Chapter 6, the principle of

collective consciousness. …This collective consciousness has the power to heal the ACE2-receptors in our bodies. If we all think together that the corona virus must not attach itself to our ACE2-receptors, then our collective consciousness will make sure this doesn't happen" (The Wire Analysis, 2020). Unfortunately, it ended up creating more confusion than elucidation. The fact remains there is no relevance of number 9 in killing the novel coronavirus.

Another belief that the virus will not survive in hot temperatures also created confusion. A social media post claimed quoting a scientist that lighting 130 candles together will increase temperature by 9 degrees. Such a claim is surely vague and unscientific. The World Health Organisation (WHO) has said: "From the evidence so far, Covid-19 can be transmitted in all areas, including areas with hot and humid weather. This means, you can catch coronavirus no matter how sunny or hot the weather is. Countries with hot weather have reported cases of Covid- 19".

Not only the first two ,there are so many unscientific activities taken by the people of India in this deplorable condition. For another instances such as clapping and clanging utensils, cow urine and dung and water of Ganges etc. There is no doubt that all these activities have an auspicious meaning but in time of Novel corona virus, these activities are utterly fruitless and unscientific as they only Carry out stupidity and depression in minds of people.

In some cases, people are more conscious about the past rather than present and the future. They believe in religion, myth and magic. One possible reason is that in times of heightened stress, people tend to resort to magical thinking and absurd behaviour, particularly when there seem to be few ways to exert control over situation which creates psychological weakness. In this connection I would like to mention a Kannada novel entitled "Samskara" where we see superstitions Brahmin people of Agrahara village who were reluctant to cremate the dead body of Naranappa, another Brahmin. Naranappa was an independent Brahmin who had no faith in Brahmanism. People were much superstitious and unscientific and for their vague beliefs, there had been spreading the plague disease. In this deplorable condition, people of Agrahara village were much conscious about their religion and caste rather than disease. For their misinterpretation of the

situation, there had been spread plague everywhere in the Agrahara village. They used to beat the gongs in order to save themselves from the plague disease.

A rural woman spoke about the rituals that she was performing which was published in a report."I have received information from my relatives via whatsapp which says you should light one diya each per sibling of yours. You are also supposed to pour that many buckets of water into a well. I have been doing his for my family," she said, adding, "A few days ago, my sister who lives in Mumbai, called me and asked to search for a certain kind of hair. If you find it, then it belongs to Lord Hanuman. Now, we have to dip the hair in water and sprinkle it inside the entire home, as it will keep the coronavirus away. I tried to find the hair, but could not find one" (Sharma, 2020). Some people believe the pandemic is a test by Allah of their faith, while some others assert that it is a sign of Allah's divine anger and punishment (Abderrahmani, 2020).

These are but a few examples of the superstitions and beliefs among thousands flooding social media during the ongoing crisis. Sometimes it is difficult to identify whether a message is based on superstition or some beliefs/misbeliefs or faith. But a scientific temperament would surely help to understand whether a message should be believed or avoided.

It is truly pathetic that some irrational people are treating with Corona patients or victims in an unauthentic manner as they are outsiders and their ruthless activity doesn't prove that it is in terms of maintaining social distancing. In the name of corona virus they are creating unscientific activities and riots. They are making gossips about a covid patient who is suspected in their eyes and consequently torturing his family and don't let them to take a clear breathe. For their unscientific behaviour and superstitious outlook, it apparently seems to the corona patients "To be or not to be-That is the question; Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or take arms against a sea of troubles and by opposing end them?" They have taken corona virus as racial problem. What is very much necessary and indispensable in this crucial moment is consciousness. But it is a miserable that most of the people are not conscious. They are more superstitious in lieu of being conscious.

It is well to be said that we live in the age of science, reason and enlightenment. Still it is deplorable that Some people use science as a fashion. We use the dress of science but our body or mind is still superstitious. Religious people can not accept it whole heartedly as they are bound to believe in superstition on account of religious fervour. Although our birth is scientific but when we grow up, we prone to believe in superstition. People believe in religious faith as religious implications compel them to believe it's conquest. superstition lies in our tradition and existence. It is really difficult task on our part to give up our tradition. We love to read science, we love to achieve degrees in science. But we are obstinate and reluctant to accept scientific thought and beliefs. We can't keep faith in scientific process because we need Speedy recovery and we believe magic can only bring speedy recovery. It reminds us the contrast between science and faith in Victorian age. Coleridge has stated a well known remark in his critique "Biographia Literaria" ,"Willing suspension of disbelief".

Actually science and scientific sensibility are two different things. Science depends on discovery; on the other hand, scientific sensibility depends on discussion. Science depends on knowledge; on the other hand scientific sensibility depends on wisdom.

What we need most in this crucial moment is awareness and self consciousness. We should maintain lockdown and use essential things related to awareness on this Covid-19. It has no race and religion. We should believe in scientific theory. The Government, state and central altogether, heart and soul is trying to find out the proper solution in respect of this crux. In this deplorable moment we should believe in science, let scientific sensibility prevail in our heart. All the preparations are going on for creating remedy on account of abolition of this harmful virus is nothing but the fruit of science...so believe in science and scientific thought. We should create scientific temper to secure our post covid future. The rise of scientific sensibility can only save us from our destruction.

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

শ্যামল প্রধান
দ্বিতীয় সেমেস্টার, ইতিহাস বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

আজ তুমি কত দূরে আছ, হে মহান,
ধরার সকল লোক গাহে জয়গান।
পশ্চিমের জয়মালা এনেছ ছিনিয়া,
তাই তো তেমায় ভালোবাসি হৃদয় ভরিয়া।
কত যে কবিতা তুমি করেছ রচনা,
মানুষের সাধ্য নেই করিতে গননা।
পৃথিবী স্তম্ভিত হয় তব প্রতিভাতে,
মাথানত হয়ে যায় তব চরনেতে।
শ্রেষ্ঠ সংগীতঙ্গ তুমি হও সর্বকালে,
উজ্জ্বল কিরীট পরায়েছে তব বঙ্গভালে।
ভারত গর্বিত আজি তব কৃতকর্মে,
তাই চিরজিত তুমি সর্ব হৃদিমর্মে!
তোমার কাছে আজ মোদের মিনতি,
আশীর্বাদ দিয়ো তুমি আমাদের প্রতি।

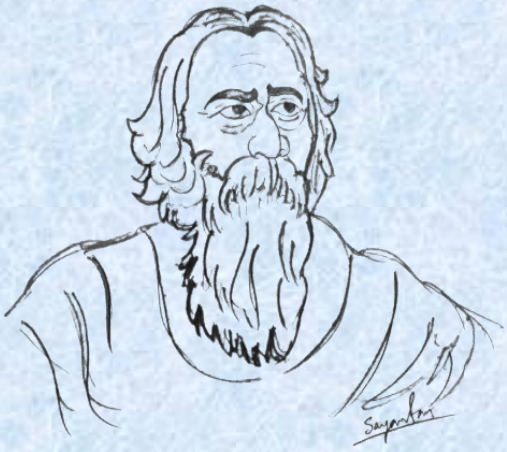

আমাদের গাঁ

প্রশান্ত দাস
ষষ্ঠ সেমেস্টার, বাণিজ্য বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

আমাদের গাঁয়ে ছিল
মন ভরা সুখ,
আর ছিল শিশুদের
হাসি ভরা মুখ।
গাছে ছিল ফল-ফুল
জলে ছিল মাছ,
মাঠে ছিল চাষবাস
ছিল বড় গাছ।
গাঁয়ে ছিল ছোটো ঘর
আর ক্ষেতে ছিল ধান,
ভোর বেলা শোনা যেত
সুমধুর কলতান ।
সর্বদা সুখে ছিল
আমাদের মন,
প্রবল দুর্যোগ কেড়ে নিল
এ গাঁয়ের ধন।।

আবেগী মন

গোপাল বেরা
চতুর্থ সেমেস্টার, বাংলা বিভাগ (স্নাতকোত্তর)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

শুভ খুব উত্তেজনার সাথে ফোনের কাছাকাছি ঘুরোঘুরি করছে। কখন একটা ফোন কল আসবে তার অপেক্ষায়। একটা গুরুত্বপূর্ণ ফোন কল। এইজন্য সে কাল সারারাত্রি জেগেছে। চোখেমুখে রাত জাগার ছাপ, মনে ভয় ও উত্তেজনা সঙ্গে ঔৎসুক্য ভরা। নিজেকে স্থির রাখতে পারছে না। অদ্ভুত একটা টান, হার্টবিট বাড়ছে কমছে।

শুভ একটা কলেজে পড়ে, তবে কলেজের সাথে চাকরির পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সে তার বন্ধু সুমনের ফোন কলের অপেক্ষায় ছিল। সুমন তাকে গুরুত্বপূর্ণ খবর এনে দেবে। আসলে আজ অনেকদিন হলো অনুর কোন খবর নেই। অনু, যাকে শুভ খুব ভালোবাসে, সেও শুভকে আশা দিয়ে অপেক্ষায় রেখেছে। শুধু পরীক্ষাটা শেষ হোক, তারপর তাদের দেখা হবে, কথা হবে। অনু স্কুলে পড়ে। শুভ অনুকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছে। মনে মনে অনেক কথা, অভিমান জমিয়ে রেখেছে দেখা হলে বলবে বলে। বন্ধু সুমন তাকে এই অনুর খবর এনে দেবে যার জন্য এত অপেক্ষা।

অপেক্ষার অবসান ঘটলো। সুমন ফোন করলো। শুভ ফোন ধরা মাত্রই তাকে জিজ্ঞেস করল – বল, কি কিছু খবর পেলি? বন্ধু খানিকক্ষণ নিশ্চুপ। সে আবার জিজ্ঞাসা করল – কিরে, কি খবর? বন্ধু বলল, তার দেখাশোনা চলছে, বিয়ে হবে শীঘ্র। শুভ এমন কথা শোনার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। বন্ধুকে আবার জিজ্ঞেসও করলো - বলবি তো সে কেমন আছে! বন্ধু বলল, তা ঠিক বলতে পারবো না, তবে তার বিয়ের জন্য দেখাশোনা চলছে। দ্বিতীয়বার এই কথাটি শোনার পর সে যেন হঠাৎ সম্বিত ফিরে পায়। সারারাত সে যে জন্য আশা, অপেক্ষা করছিল তা তো হল না, উল্টে তার বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগলো। সুমন বলল, আমি একজনকে দিয়ে খবর নিয়েছি সেই আমাকে জানালো কথাগুলো। শুভর মাথায় যেন একেবারে আকাশ ভেঙে পড়লো। এ কথাটা সে কখনো মাথায় আনতে পারেনি। কারণ সে যে তাকে আশা ভরসা দিয়েছে। তার হাত পা কেমন কেঁপে উঠল সে আর কথা বলার মতো অবস্থায় নেই। সে যে অনুকে খুব ভালোবাসে। ভয়ে, দুঃখে, বিরক্ত হয়ে, হঠাৎ করে সে বন্ধুর কল কেটে দিলো। ঘন্টা আধেক তার মাথায় এক অদ্ভুত বোধ কাজ করছিল। সে যেন একটা গভীর অন্ধকারে ডুবে। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে অনুর চোখ দুটো। যার মধ্যে আছে তার প্রতি গভীর ভালোবাসার অনুভূতি।

আবার সে সুমনকে ফোন লাগাল। সে তাকে অনেক রকম ভাবে ভরসা দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু সব বিফলে, আবেগি মন অতশত কিছু মানতে চায় না। সুমনের কাছে ছলছল নয়নে, ভেজা গলায় শুভ বলল –বল না বন্ধু সব মিথ্যে কথা বলছিস। সুমন একেবারে চুপ। শুভ গভীর আবেগে বলে ফেললো অনুকে ছাড়া আমি এক মুহূর্ত থাকতে পারবো না। এভাবেই তাদের মধ্যে দেড় ঘন্টার মত কথা চলতে থাকে।

শুভ বাড়িতেই ছিল, কিন্তু সে টেনসনে পড়ে ডিপ্রেশন হয়ে কখন যে ফোনে কথা বলতে বলতে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে হেঁটে যেতে লাগলো তার আর হুঁশ থাকলো না। রাস্তায় চলতে চলতে কখন যে মাটির টিলায় হোঁচট খেয়ে তার আঙ্গুল থেকে রক্ত ঝরে পড়েছে সেদিকেও নজর নেই তার। অনেক রাস্তা এগিয়ে অনেকক্ষণ কথা বলার শেষে বুকে একরাশ হতাশা আর পরাজয়ের ভাব নিয়ে বন্ধুর কলটা কেটে দিল।

সে আরো কয়েক পা এগিয়ে যাওয়ার পর বুঝতে পারল যে বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছে। সামনে একটা বাঁধ, সেই বাঁধের উপর উঠে সামনের দিকে চেয়ে দেখে সামনে জলভরা বড় ফাঁকা মাঠ, অনেক দূর পর্যন্ত ফাঁকা। হালকা হওয়া দিচ্ছে। ছোট ছোট ঢেউ বাঁধের ধারে আছড়ে পড়েছে। মাছরাঙ্গা নিজের গতিতে জলকে ভেদ করে মাছ ধরায় ব্যস্ত। অনেক দূরে আকাশে অনেক উঁচুতে ঘড়ি উড়ছে। জনমানবহীন শূন্য সে স্থান। প্রকৃতির নিরাবিল বাতাসে পাখিরা মুক্ত আনন্দে কিচিরমিচির করছে। মাটির উপর ছোপে ছোপে দূর্বা। সে সেখানে মাটির উপর বসে পড়ে এক দৃষ্টিতে এসব দেখতে থাকে। খানিকক্ষণ পর সে হাত পা ছড়িয়ে সেই দূর্বার উপর শুয়ে পড়ে। আকাশের দিকে চেয়ে দেখে নীলাকাশ। সেই নীলাকাশের বুকে পাখিরা খেলা করছে। তুলোর মতো দেখতে মেঘগুলো উড়ে চলেছে। এক মুহূর্তের জন্য সমস্ত চিন্তা, চাপ তার মাথা থেকে উধাও হয়ে গেল। এক উদাসীন মুক্তির হাওয়া আর নেশা মাখানো আনন্দের আহ্লাদ হঠাৎ যেন তার মনকে ছুঁয়ে গেল।

আকাশের দিকে তাকাতে তাকাতে শুভর কখন যে চোখের পাতা বুজলো সে নিজেও টের পেল না। যখন ঘুম ভাঙলো তার মনে হল সবসবকিছুই স্বপ্ন ছিল।

আত্মশুদ্ধির পথে

সুদেষ্ণা সামন্ত
দ্বিতীয় সেমেস্টার, সংস্কৃত বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

যে স্বপ্নকে সামনে রেখে স্বাধীনতা এনেছিল
বিপ্লবী বীর সেনারা,
আমি দেখতে চাই সেই স্বাধীনতা।
স্বার্থন্বেষী, ন্যায়-নীতিজ্ঞানহীন মানুষের
স্বচ্ছন্দ বিচরণ ভূমি দেখতে চাই না।
অশিক্ষার নাগপাশ থেকে মুক্তির দাবিতে সোচ্চার যখন,
তখন তো দেখি চক্রবুহ্য রচনা করে চলেছে
অভিমুন্য বধের পালা।
বিশ্ব সমাজ আজ সন্ত্রাসবাদের স্বীকার,
কিন্তু কেন অমানবিক কাজে লিপ্ত তারা –
অনুসন্ধান করে দেখেছ কি কেউ?
অখণ্ড ভারতের অনন্ত আশা প্রত্যাশায় সবাই যখন বিভোর,
সেখানেও মিথ্যা প্রবঞ্চনাময়
অতিরঞ্জিত আশ্বাস আমি চাই বেহুলা, লক্ষিন্দরের মতো।
শিশু, নারীর নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা।
মুছে যাক তমসাচ্ছন্ন ভয়াল ভয়ংকর কালরাত্রি
তোমার পিতৃপুরুষের শ্রীচরণ যুগল।
ওইখানে খুঁজে পবে চির আকাঙ্খিত অমূল্য সম্পদ,
পবিত্র গঙ্গায় অবগাহন নিষ্পয়োজন।
আত্মশুদ্ধিই হোক জীবন পথের পাথেয়।
বিষাক্ত পানীয় ফেলে অমৃত হোক সঞ্জীবনী সুধা।
নিজেকে ভালোবেসে অপরকে ভালোবাসো।
তাই যেন হয় ভাতৃত্বের সেতুবন্ধন।
অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের ভালোবাসা
আজ শুধু কাব্যিক কাহিনিতে পরিনত।
পিতৃ,মাতৃ,ভ্রাতা, প্রজাবর্গ এবং পত্নী
সকলেই ছিল তার প্রিয়জন।
বিভেদ বিচ্ছেদ মুছে যাক চিরতরে,
প্রেম প্রীতি হোক মূলমন্ত্র।

লকডাউন ডায়েরি : Covid-19 এর সময়কালীন জীবনের একটি কাল্পনিক ঘটনা

সুনন্দিতা মন্ডল
ষষ্ঠ সেমেস্টার, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

একটি ডায়েরি হলো স্বভাবতই একটি তীব্র ব্যক্তিগত জিনিস। এটি আমাদের চারপাশের বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ চিন্তা ভাবনা এবং উদ্বেগ রেকর্ড করার জায়গা। অন্যকথায়, এটি আমাদের মনের অবস্থাটির ঝলক।

কোভিড-19 প্রাদুর্ভাব
2020 সাল

যখন আমি প্রথম কোভিড-19 এর কথা শুনেছি, ভেবেছিলাম মৃত্যুহার কম হওয়ার আতঙ্কটি অপ্রয়োজনীয় । কিন্তু যখন আমি লকডাউনের সম্মুখীন হলাম তখন এর গুরুত্ব বুঝতে পারলাম।

নিজস্ব প্রতিবেদন:-

করোনাভাইরাস এর জেরে গোটা দেশে লকডাউন। একে তো সারা দেশে সংক্রমণ ছড়িয়েছে আগুনের মত। তার ওপর আবার লকডাউন-এর জেরে মানুষের পেটে টান। উভয় সংকট, আর এই সংকট কবে কাটবে কেউ জানে না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানাচ্ছে, করোনা এত সহজে যাবে না। মানব জাতিকে এই প্রাণঘাতী ভাইরাসকে সঙ্গে নিয়েই বাঁচতে শিখতে হবে। তবে Covid-19 এর তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এই মানব জীবন।

আমি শুনতে আগ্রহী ছিলাম কিভাবে লোকেরা এই সম্পূর্ণ নতুন জীবন যাত্রার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। ২২শে মার্চ থেকে এই লকডাউন শুরু হয়েছে। যেখানে স্কুল-কলেজ, শপিং মল, বাজার, দোকান বাস-ট্রেন অফিস ইত্যাদি সবই বন্ধ।

মার্চ মাস:-

প্রথমে 15 দিন ছুটির কথা শুনে বেশ ভালই লেগেছিল। তারপর মোদীজি যখন আবার এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত সর্বভারতীয় লকডাউন ঘোষণা করেছেন। আমি এটা বিশ্বাস করতে পারিনা, তবে ভাবলাম লকডাউনে কিভাবে দিনগুলো কাটবে।

চিকিৎসকের পরামর্শ:-

বিশ্বজুড়ে করোনা আতঙ্ক করুনা মোকাবিলা করতে বাড়িতে থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকেরা, ডাক্তারি ভাষায় যাকে বলে হোম কোয়ারেন্টাইন। এবং কিছু নিয়ম মেনে বাড়িতে থাকতে বলা হয়েছে, যেমন-

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের উপায় :-

হাত সবসময় সাবান বা জীবানুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করা
হাত না ধুয়ে মুখ, চোখ ও নাক স্পর্শ না করা
ঠান্ডা বা ফ্লু হওয়া ব্যক্তির থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা
বন্য জীবজন্তু কিংবা গৃহপালিত পশুকে খালি হাতে স্পর্শ না করা
হাঁচি বা কাশি দেওয়ার সময় অবশ্যই মুখ ঢেকে রাখা
ঘরের বাইরে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করা

অনলাইন কোর্স :-

লকডাউন-এর দিন গুলো কিভাবে পড়াশোনা করা যায় তার জন্য Sir - Madam রা একটি অনলাইন কোর্স শুরু করলেন। যাইহোক, এইভাবে ক্লাস করে এবং বন্ধুদের সাথে অনলাইনে ক্লাস করতে ভালোই লাগত।

সপ্তাহে রবিবার বাদ দিয়ে বাকি 6 দিন আমার 10-12 জন বন্ধু বান্ধবীদের সাথে ও স্যার বা ম্যাডাম দের নিয়ে আমাদের অনলাইন ক্লাস হয়।

এপ্রিল মাস:-

এতগুলো দিন যাই হোক পুরো পরিবারের সাথে দূরদর্শন, বিভিন্ন গেম- সো , এবং গল্পের বই পড়া ও অনলাইনে ক্লাস করে সকাল সন্ধ্যা গুলো কেটে যেতে লাগলো। গুজব শুনেছিলাম লকডাউন কি বাড়ানো হবে! দেখতে দেখতে লকডাউন দীর্ঘদিনের জন্য বেড়ে গেল।

এরইমধ্যে শুনতে থাকলাম যে প্রশাসন আটকে যাওয়া শ্রমিকদের দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য বাসের ব্যবস্থা করেছে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে আটকে পড়ে থাকা শ্রমিকদের বাড়ি ফেরানোর জন্য বহু বাসের ব্যবস্থা করা হয়। এবং তাদেরকে কিছুদিনের মধ্যে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়। শ্রমিকদের সাথে সাথে অনেক পড়ুয়ারা বাইরে থাকায় তাদেরও বাড়ি ফিরিয়ে আনা হয়।

কোয়ারেন্টাইন:-

পরিযায়ী শ্রমিকদের এবং পড়ুয়ারা বাড়ি ফিরে আসলেও তাদের কিন্তু বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তাদের জন্য এলাকাবাসী একটি নির্দিষ্ট জায়গা দেখে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার বানিয়ে তাদের ১৪ দিনের জন্য রাখা হয় এবং সেখানেও তাদের পরিবার পরিজনের সাথে ও এই সময় দেখা করতে দেওয়া হতো না। আবার, করোনা হতে পারে এমন ব্যক্তিকে সরকারি কোয়ারেন্টাইন-এ নিয়ে যাওয়া হতো, ওখানেও কমপক্ষে ১৪ দিনের সময়সীমা।

মে মাস:-

এই ভাইরাসের মত দিন কাটতে কাটতে হঠাৎ আরেকটা নতুন বিপদ নেমে এলো ১৬ই মে আমফান ঝড়। এর প্রভাবে প্রচুর ঘরবাড়ি গাছপালা ইত্যাদি ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে। এবং অনেক মানুষ এই ঝড়ে প্রাণ হারিয়েছে। আম্ফান এর পর আবার নিসর্গ ঝড় দেখা দিল। এরই সঙ্গে দেখা দিল পতঙ্গ পাল যা বিঘার পর বিঘা জমির ফসল ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে দিয়েছে।

লকডাউন এর জন্য আমি যখন দিন গণনা করছিলাম, অন্যদিকে দিনদিন ভাইরাসের প্রভাবে মানুষ যেভাবে আক্রান্ত হচ্ছে এর মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। চিকিৎসকেরা রাতদিন এক করে রোগীদের সারিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। গবেষকেরা বলছেন এই মহামারী ১০০ বছর অন্তর ফিরে আসে।

এখন আর টানা লকডাউন নেই। তাই রাজ্য সরকার এখন সপ্তাহে দুদিন করে বন্ধ করার কথা বলছেন। ধীরে ধীরে কিছুদিন কাটার পর দেখছি বাড়ির আশেপাশে অনেকেরই করোনা হয়েছে। কেউ কেউ কোয়ারেন্টাইনে আছেন। কেউবা সরকারি কোয়ারেন্টাইনে, আবার কিছু জন এই ভাইরাসের জন্য প্রাণ হারিয়েছেন। আবার অনেকেই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে এসেছেন।

লকডাউন কেটে গেলেও দোকান, বাজার হাট ,কল-কারখানা, অফিস খুললেও মানুষ বাড়ির বাইরে বেরোলেই মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক ছিল।

করোনা ভাইরাস কিভাবে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। কত মানুষের জীবন ধ্বংস করেছে এবং কত লোকের পরিকল্পনা এবং স্বপ্নকে নষ্ট করে দিয়েছে।
লকডাউন- আমি জানি না এটি Covid-19 বা বোকা লকডাউন। যা আমার জীবনকে এই কয়েক মাসে এক দুঃস্বপ্নের পরিকল্পনা করে তুলেছে।

২০২১ সাল

দেখতে দেখতে আগের বছরের তুলনায় এ বছরের প্রথমে Covid-19 এর প্রভাব কম দেখা দিলেও তা একদম নির্মূল হলো না। আমাদের দেশে (ভারত) ভোট নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন দলের নেতা মন্ত্রীরা তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ভোট প্রচার চালিয়ে গেছেন। এবং এর জন্য অসংখ্য মানুষ Covid-19 এ আক্রান্ত হয়েছেন এবং এর পরিণতি মৃত্যুও হয়েছে।

ধীরে ধীরে আবার লকডাউন হওয়া শুরু হয়। প্রথমে প্রথমে এটি খুব জোরালোভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। তারপর মাসের মধ্যে প্রথমে শক্তিশালী হয়ে আবার এখন লকডাউন থাকলেও দুর্বল হয়ে পড়ে। যদিও এখন Covid-19 এর জন্য Vaccine দেওয়া হচ্ছে।

বিশ্বের অন্যান্য অনেকের মতো Covid-19 ইতিমধ্যে আমার জীবনে প্রভাব ফেলেছে। ভ্রমণ পরিবর্তন এবং সরকারি বিধি নিষেধের কারণে আমি বাড়িতে অনিশ্চিত সময়ের জন্য থাকতে বাধ্য হয়েছি, সেমেস্টার পরীক্ষা অনলাইনে হয়েছে। এটি একটি উত্তেজনাপূর্ণ সময়, গ্রামের ক্ষেত্রে বাড়িতে বন্ধ হয়ে থাকা সহ্য করা কঠিন ছিল। Covid-19 একটি বিশাল বিপর্যয় এনেছে। এটি জীবন কেড়ে নিয়েছে। এবং বিশ্বের শক্তিশালী কয়েকটি দেশ ও সংস্থাকে চ্যালেঞ্জ করেছে। এটি বেশ কয়েকটি শিল্প এবং দেশগুলির জন্য বৃহৎ আর্থিক ও অর্থনৈতিক সংকট তৈরি করেছে।

তবে এই Covid-19 পরিস্থিতিটা আমাদেরকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখিয়েছে। প্রথমত আমাদের সর্বত্র মানুষের জীবনকে মূল্য দিতে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই মহামারী বৈশ্বিক দূষণ কমাতে সহায়তা করেছে। রাস্তায় কম গাড়ি এবং আকাশে কম বিমান রয়েছে, পৃথিবী নিরাময়ের জন্য এক মুহূর্ত পাচ্ছে। তৃতীয়ত, এটি আমাদের জীবনে ছোট ছোট জিনিসকে মূল্য দিতে শিখিয়েছে যা আমরা ভাল স্বাস্থ্য, সুন্দর প্রকৃতি এবং উভয়কে অবাধে উপভোগ করার সুযোগের জন্য মর্যাদা করি। আজও আমরা আশা করি একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।

বেকার

টুম্পা পাত্র
চতুর্থ সেমেস্টার, বাণিজ্য বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

কাজ করতে চাইছে যারা
পায় না তারা কাজ,
এইভাবে তো বাড়ছে দেশে
লক্ষ বেকার আজ।
ছোটাছুটি ঘোরা ঘুরি
করছে অনেক জন,
এইভাবে সারা দেশে
চলছে সারাক্ষণ।
বাধ্য হয়ে ওরা সবাই
কুসঙ্গতে মেশে,
কেউ বা ভেড়ে চোরের দলে
কেউ বা ডাকাত শেষে।
কেউ বা তখন ফেরার হয়ে
মেশে গুণ্ডা দলে,
কেউ বা আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে
রেলের চাকার তলে।

রঙিন জীবন

প্রীতিলতা সামন্ত
দ্বিতীয় সেমেস্টার, বাণিজ্য বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

ভীষন আঘাতে অশ্রু সাগর, অথৈ জলে ভাসি
কখনো আসে সুখের রসদ, নির্ভেজাল হাসি;
ভীষন ক্ষোভে দুর্গম পাহাড়, ডিঙানো সহজ নয়,
আবার পরে শান্ত নদী, সহজ ভাবে বয়।

নানা রঙের নানা প্রকাশ, জীবন যেন রঙের বাহার
জীবন এভাবে চলুক, ফিরুক, জীবন এভাবে চক্রাকার।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি প্রবেশ গ্রহণ যোগ্য নয়

সৌভিক মান্না
দ্বিতীয় সেমেস্টার, ভূগোল বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

মতের পক্ষে :

রাজনীতি দৈনন্দিন জীবনে মানুষের পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখনকার মানবসম্প্রদায় প্রত্যেকটি কাজের সাথে রাজনীতিকে জড়িয়ে ফেলে, ঠিক তেমনই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত জায়গায় কখনোই রাজনীতি মানায় না। ছাত্রসমাজে শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আজকালের যুগে দেখা যায় বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীকে ১৮ বছর হলেই রাজনীতির খাতায় নাম লেখাতে হয়। যারা সমাজের মেরুদন্ড, তারাই একসময় অতল তলায় তলিয়ে যায় রাজনীতি করতে গিয়ে। স্কুল ও কলেজে সবাই পড়াশুনা করতে আসে না। কিছু কিছু ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে যারা পড়াশুনার বদলে কিছু অপ্রাসঙ্গিক কাজ করে চলে যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কখনো মানায় না। যেমন ক্লাসরুম এর মধ্যে মারামারি, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অপমানজনক কথা বলা, তাদের নিয়ে সমালোচনা করা এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার শিক্ষক শিক্ষিকাদের গায়ে হাত তোলা। এই কথাগুলি আমার মনগড়া কথা নয়, ছাত্রসমাজে ছাত্রছাত্রীদের আমি দেখেছি এরুপ আচরণ করতে। সেই অভজ্ঞতা থেকেই আমি কথাগুলো বলছি। অন্য প্রসঙ্গে যদি বলা যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমস্যা হতেই পারে, সমস্যা হওয়াটাই স্বাভাবিক, স্কুলে বা কলেজে যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয় সেটা নিয়ন্ত্রণ শিক্ষক ও শিক্ষিকারা করবেন বা কলেজের প্রিন্সিপাল করবেন। কিন্তু আমি আমার Educational life-এ দেখেছি তার বিপরীত ঘটনা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি প্রবেশ করল এবং কলেজ প্রাঙ্গণকে একটি অসস্তিকর পরিবেশে পরিণত করল রাজনৈতিক দল। এমনটা কেন হলো! কেনই বা হবে! শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মত জায়গায় এটা কখনোই কাম্য নয়। এক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে রাজনীতি বেশিরভাগ কলেজ প্রাঙ্গণে পরিলক্ষিত হয়। ছাত্রছাত্রীরা যদি ক্রমাগত অপ্রাসঙ্গিক কাজ করে থাকে বা কোনোরকম ভুল ত্রুটি করে থাকে তার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেবে কলেজ কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সেখানে যেন আবার রাজনীতি প্রবেশ না করে। কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো মন্দির তুল্য জায়গা, সেখানে ঠিক এইরূপ পরিস্থিতি কাম্য নয়। তাই সমস্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিদের আমি বলবো এইরূপ আচরণ যেন বারংবার না করা হয়।

মতের বিপক্ষে :

রাজনীতি ছাত্র সমাজের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর দিক এবং ছাত্রছাত্রীদের সবিনয় মনোভাবকে নিমেষের মধ্যে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তোলে এই রাজনীতি। আবার বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে দেখা যায় যে রাজনীতি শুধু ছাত্রসমাজের ক্ষতি করে তা নয়, এছাড়াও অন্যান্য দিক উপকার করে থাকে। স্কুল ও কলজে লক্ষ্য করা যায় যে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যে হিংসা পরায়ন মনোভাব একসময় যখন ক্রমাগত বেড়ে যায় তখন শিক্ষক শিক্ষিকারা সামাল দিতে পারে না ঠিক তখন ই যে অসস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়, সেই অসস্তিকর পরিবেশকে সভ্য

সমাজে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশে পরিণত করতে ছাত্র সমাজের কথা মাথায় রেখে কলেজ প্রাঙ্গণের মধ্যে রাজনীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে স্কুল ও কলেজে যাই সমস্যা হোক না কেন, সেই সমস্ত ছাত্রছাত্রী দের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। আবার রাজনীতির মূল স্রোতের দিকে যদি লক্ষ্য করা যায়, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের মানুষেরা বিভিন্ন সূত্রে কলেজের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং অসস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করেন, ফলে শিক্ষার্থীদের মানসিক পরিবর্তন হয় এবং সৃজনশীল মনোভাবের পরিবর্তন হয়। তারাও একসময় রাজনীতিতে যোগদান করে। যেসমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা আগামীকালের সমাজের মুখ উজ্বল করবে, যাদের দেখে সমাজের মানুষ যদি কিছু শিখতেই না পারল, তাহলে কীসের এই ছাত্রসমাজ! আমার জানি, রাজনীতি মানুষের কল্যাণ করে। আজকের বর্তমান যুগে তার বিপরীত ঘটনা দেখা যায়। আজকালের মানুষেরা রাজনীতি করতে গিয়ে দেখা যায় মানুষের মূল্যবোধ লোপ পেয়েছে, যা সমাজের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। এই ধরনের রাজনীতি আমরা চাই না। রাজনীতি এমন হবে যা মানুষের কল্যাণ করবে। মানুষের কিছু অধিকার রয়েছে যা তাদের প্রাপ্য, কিন্তু আজকালের যুগে রাজনৈতিক দলেরা তাদের সেই অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে। এই রাজনীতি কখনই মানুষের কল্যাণ করতে পারে না। ছাত্র সমাজের তো একেবারেই কল্যাণ করতে পারে না। তাহলে এই রাজনীতির কি কোনো দাম আছে যদি মানুষ সুখ শান্তি না পেল! সমাজের মূল স্রোত থেকে তারা হারিয়ে যায়। কিন্তু এটা দেখতে হবে এখনকার সমাজ কি বলছে মানুষ পূর্বকাল ধরে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে আসছে। মানুষ কি তার নিজের চরিত্র, স্বভাব এখনও বদলেছে? আমার তো তা মনে হয় না। যে রাজনৈতিক দল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ওপর জোর কোরে রাজনীতি করতে বাধ্য করে। কে রাজনীতি করবে কী করবে না সেটা তার নিজস্বই ব্যাক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু যেসমস্ত রাজনৈতিক নেতারা জোর করে রাজনীতি করতে বাধ্য করে তারা অত্যন্ত কুৎসিত বর্গের মানুষ। কিন্তু আজকালের মানুষের সাহস দেখে অবাক হতে হয় যা সাধারণ মানুষ কখনোই আশা করেনি। কিন্তু আজকালের যুগে মানুষ শিক্ষা নিয়েও রাজনীতি করে এটা কী কোনো চরিত্রবান মানুষের প্রকৃত আচরণ? সর্বোপরি আমি শেষ একটা কথা বলি। কথাটি সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের জন্য যথার্থ মর্যাদার সহকারে বিষয়টি উপস্থাপন করা হলো। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হওয়া আবশ্যক। কথাগুলো হলো রাজনীতি নিয়ে কখনোই খুনোখুনি, মারামারি করো না, কোনো মায়ের চোখের জল ঝরিও না। যদি পারো মানুষের উপকারে এসো, এখনো অনেক মানুষ রয়েছে যারা নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত, তাদের সেই প্রাপ্য অধিকার পাইয়ে দাও। মানুষের সুখে দুঃখে তাদের পাশে থেকো, যদি পারো তাদের চোখের জল মুছিয়ে দাও। রাজনীতি মানে শুধু হিংসা পরায়ন মনোভাব নয় রাজনীতি বা Politics হলো একে ওপরের প্রতি সহযোগিতা, যা মানুষের জন্ম জন্মান্তর ধরে মনে রাখা উচিত। আমি মনে করি এটাই প্রকৃত রাজনীতি।

মাসের মজা

গোপাল দিন্দা
দ্বিতীয় সেমেস্টার, সংস্কৃত বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

বৈশাখেতে আম্র ভীষণ
পাকছে ডালে ডালে,
ভাবছি বসে পড়বে কখন
খাইবো মনে মনে।
জৈষ্ঠ্যতে আবার বড্ড গরম
পড়বে কবে ছুটি,
থাকবো বসে ঘরের কোণে
লাগবে দক্ষিণের এসি।
আষাঢ়েতে মেঘ এসে ওই
করবে গুড়ুগুড়ু,
শ্রাবণতে বৃষ্টি হয়ে
ভরবে নদী পুকুর।
ভাদ্রতে ওই ভদ্র মানুষ
থাকছে মিলে মিশে,
যাচ্ছে তারা একসঙ্গে
কৃষক বন্ধুর সাথে।
অশ্বিনেতে রংবাহারি
কত রকম ফুল,
তার থেকেও লাগছে ভালো
শিউলি আর কাশফুল।
কার্ত্তিকের ওই ময়ূর পক্ষী
ঘুরছে ডালে ডালে,
অঘ্রাণেতে হেমন্ত সুর
বাজছে সবার কানে।
পৌষের হওয়া লাগলো গায়ে
আসছে বুঝি শীত
মাঘে আবার ঠান্ডা ভীষণ
লেপের সাথে ফিট।
বসন্তের ওই কোকিল ডাকে
এসেছে ফাল্গুন মাস,
নতুন রং এ সাজবে সবাই
দেখবো আরেক বার।
চৈত্রতে আবার শিবের পূজা
বাবার মাথায় জল,
চড়ক দিয়ে শেষ করবো
বসন্তের কোলাহল।

স্বপ্ন ঘাতক করোনা

প্রীতিলতা সামন্ত
দ্বিতীয় সেমেস্টার, বাণিজ্য বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

হাসপাতালের দালানের মেঝেতে এক কোণে বসে আছি আমি, কোলে দুচোখ বুজে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে আমার স্বামী। বাইরের ঘড়িতে দেখতে দেখতে একটা বেজেছে, চারিদিকে নিস্তব্ধতার আলিঙ্গনে অন্ধকার নেমেছে। রাত জাগা পাখি গুলোও কেমন চুপচাপ, নেই ঝিঁঝিঁর শব্দ, আকাশে চাঁদ আছে, ঔজ্জল্যহীন। মহামারী এসে যেন সব স্তব্ধ, রাস্তায় লোক চলাচল নেই, বন্ধ বাড়ির সদর, হাসপাতালে ভেতরটাতে আলো আছে, তবু ধুঁকছে কত প্রাণ। ভোর হতে না হতেই রাক্ষসী অতিমারী দিন আসবে, কেটে যাবে এই নীরবতা।

‘বেড নেই, অক্সিজেন চাই' আমার মত স্বামীহারাদের কান্না, বীভৎসতা। গত সপ্তাহটা কী ভালো কেটেছিল! মেয়ে জামাই এসেছে অনেক বছর পর- পাশের বাড়ির মিনতির মেয়ের বিয়ে ছিল কিনা! সবাই ছিল আনন্দমুখর। আনন্দ আর রইল না, সেদিন রাতে হঠাৎই ওনার শুকনো কাশি, গা পুড়ছে জ্বরে।কদিন ধরেই বলছিলেন মাথাটা ধরে আছে বড্ড, যন্ত্রণা পায়ে আর কোমরে। ভেবেছিলাম কমে যাবে, যন্ত্রণা হয়তো বিয়ে বাড়িতে খাটাখাটনির রেশে, কিন্তু হঠাৎ বাড়াবাড়ি! রেজাল্ট পজিটিভ, ঐ অপয়া ভাইরাসে ধরল শেষে।

ঔষধ খাওয়ানো হলো, লাভ হল না, শুরু হলো নিদারুণ শ্বাসকষ্ট, হাসপাতলে ভর্তি এবার করতেই হবে। আর না সময় নষ্ট। এই ভেবে অ্যাম্বুলেন্স খুঁজি, কিন্তু পাইনি জানেন, ফোন করেছি অনেক, সবগুলোই বুক হয়ে গেছে, কিংবা আসতে অনেক দেরি হবে, অসুস্থ কত শতেক।

অ্যাম্বুলেন্স না পেয়ে অগত্যা একটি টোটো ডেকে আনে আমার জামাই, টোটো চালকও নারাজ করোণা রোগী নিয়ে যেতে, বাধ্য হয়ে হাতে পায়ে পড়ে যাই। চালক রাজি হলে ওনাকে টোটোতে তুলি আমি আর জামাই মিলে, করোনার ভয়ে সিঁটকে মিনতির মত পড়শীরা সব গেছে চলে। যাদবপুরে আমাদের বাড়ি থেকে ডেবরা হাসপাতালটা কাছে, তড়িঘড়ি করে ওখানেই নিয়ে যাই, ক্রমশ শরীরের দুর্গতি হচ্ছে।

বিপত্তির শুরু এখানে, ওখানের ডাক্তাররা রেফার করেন কলকাতাতে কারণ ‘বেড নেই’। পরদিন কলকাতাতে ছুটে যাই, একই প্রত্যাখ্যান, 'বেড নেই' কারণ একটাই। দুটি হাসপাতল ঘোরার পর লাগাতার ফোন করি স্বাস্থ্য দপ্তরে তবুও কোন সাহায্য মেলেনি ভর্তির ব্যাপারে।

এদিকে ওনার সে কি শ্বাসকষ্ট! অক্সিজেন দেওয়ার চেষ্টা করেছি মুখে মুখ দিয়ে। অক্সিজেন লাগবে! ক্লাবে সংস্থায় সমাজকর্মীদের কাছে সাহায্য চেয়েছে মেয়ে। অবস্থা গুরুতর হতে, নিয়ে যাই কলকাতা মেডিকেল কলেজে পুলিশি সহায়ে।

ঘন্টা চারেক পর ভর্তি করানো হলো শেষ-মেষ অনেক অনুনয় বিনয়ে। চিকিৎসা শুরু হতে

হতে কেটে যায় বেশ কয়েক ঘন্টা, আরো রোগী যন্ত্রনায় কাতরাচ্ছে ভ্রুক্ষেপ করেনি কেউ একটিবারও। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকেউ দোষ দিয়েও বা কি হবে। শত শত রোগী আসছে রোজ কাকে ছেড়ে ওরা কাকে দেখবে? উনি যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। আমি তখন কি করি কোথায় যাই, 'ইমিডিয়েট অক্সিজেন লাগবে' জানিয়েছেন ডাক্তার। অক্সিজেন চাই কিন্তু কোথাও না পাই-

যতক্ষণে অক্সিজেন এল, ততক্ষণে সব শেষ - বাঁচাতে পারলাম না, প্রাণবায়ু বেরিয়ে পড়ে আছে দেহের অবশেষ।

প্রকাণ্ড একটা পাহাড় যেন বুকের ওপর পড়ল হঠাৎ! ওনাকে নিথর দেখে যেন হারিয়ে ফেলেছি সম্বিৎ। অদ্ভুত ব্যাপার কি জানেন! লোকটা চলে গেছে প্রায় দশ ঘণ্টা আগে, দেহ এখনও পড়ে, 'অ্যাম্বুলেন্স অন্য কাজে ব্যস্ত' পৌরসভা এই এক কথাই জানাচ্ছে বারে বারে। দেহ কোলে নিয়ে বসে আছি, ঘুরতে আসা সময় গুলো ভাবছি। পিউ কে বড্ড বেশি ভালোবাসতেন, স্বপ্ন দেখতেন আই পি এস বানাবেন, মেয়েটা তাই বিয়ের পরও পড়াশোনা করছে। বাবার স্বপ্ন পূরণ করাটাই তার ইচ্ছে। হায়! সেই স্বপ্নকে রাক্ষসী ভাইরাস খেয়ে ফেলেছে গিলে! এইভাবে রোজ স্বপ্ন বুকে নিয়ে কত মানুষ যাচ্ছেন চলে!

মানুষ এবার সচেতন হোক, পৃথিবী আবার সুস্থ হোক, চলে যাক মারণ করোনা ভাইরাস। আবার সবাই স্বপ্ন দেখুক সোনালী ভবিষ্যতের, কেটে যাক এই মহামারী ত্রাস।

করোনা ভাইরাস

চন্দন মাজি
চতুর্থ সেমেস্টার, কলা বিভাগ (স্নাতক, সাধারণ)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

চীন আবিষ্কৃত ভাইরাস -
নাম করোনা।
বাড়ি ভিতর থাকবে সবাই,
কেউ বাইরে যেও না।
রাস্তাঘাট তো নিস্তব্ধ ,
নেই কোন সাউন্ড;
ভাইরাস থেকে বাঁচাতে সরকার
করেছে লকডাউন।
স্কুল-কলেজ দোকান-বাড়ি
সব হয়েছে বন্ধ,
বাতাসে তো ভাইরাস!
রয়েছে আতঙ্কের গন্ধ।
লক্ষ লক্ষ মানুষ শুধু
মরছে দিনরাত,
ভাইরাস থেকে বাঁচতে মানুষ
ধুচ্ছে সাবান দিয়ে হাত।
কাজের জন্য বাইরে বেরোলে
পুলিশ মারছে আবার ধরে,
চাষবাস তো সবই বন্ধ
মানুষ মরছে অনাহারে।
মৃত্যুর পর মৃত্যু দেখে
মানুষ হয়েছে আজ অন্ধ,
চন্দন একা বসে আছে
দরজা রয়েছে বন্ধ।

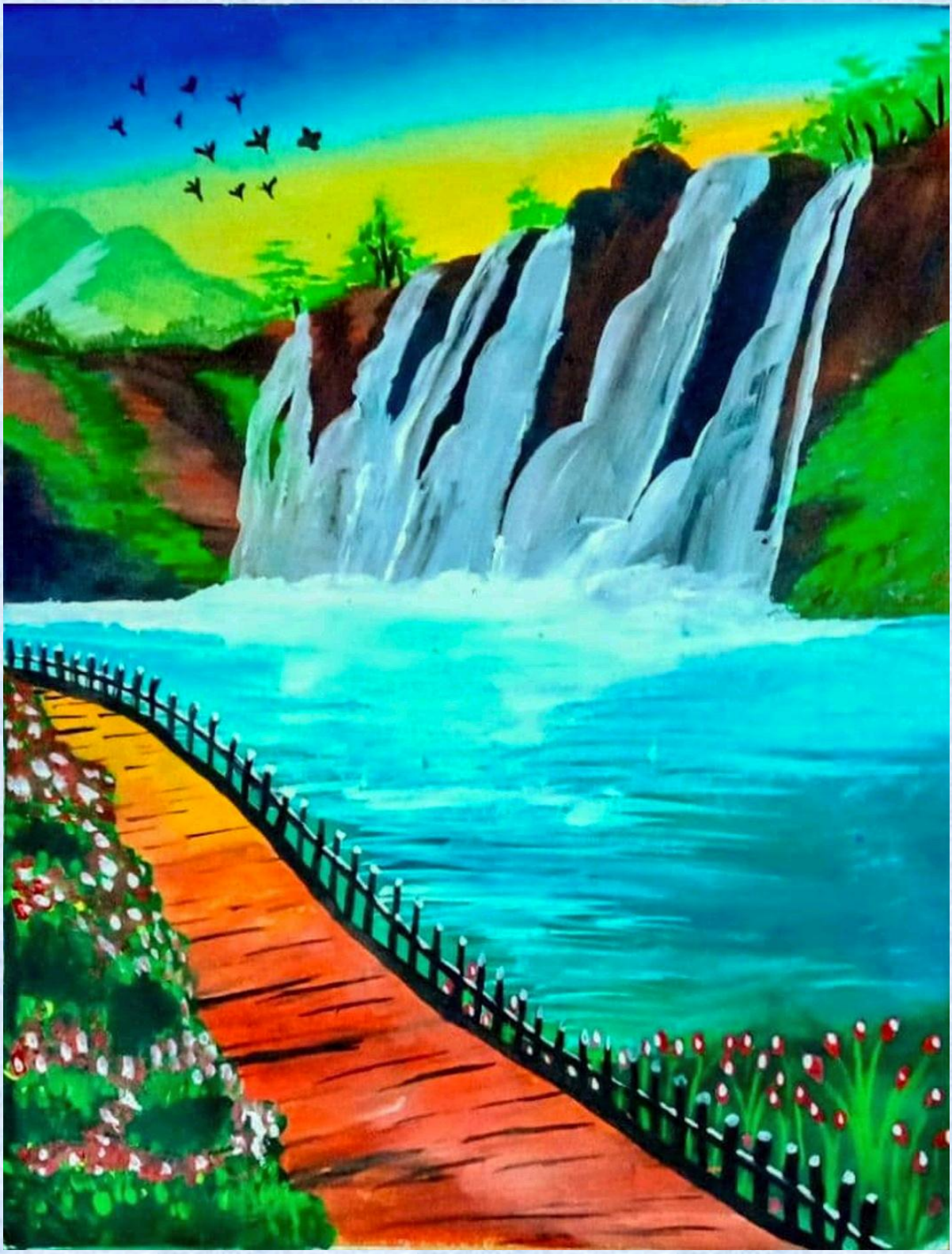

চিত্র: শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে

চিত্রাঙ্কণ: দুর্গা বেরা
চতুর্থ সেমেস্টার, দর্শন বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

চিত্র: রঙ-রঙিন

চিত্রাঙ্কণ: শম্পা সিং
ষষ্ঠ সেমেস্টার, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

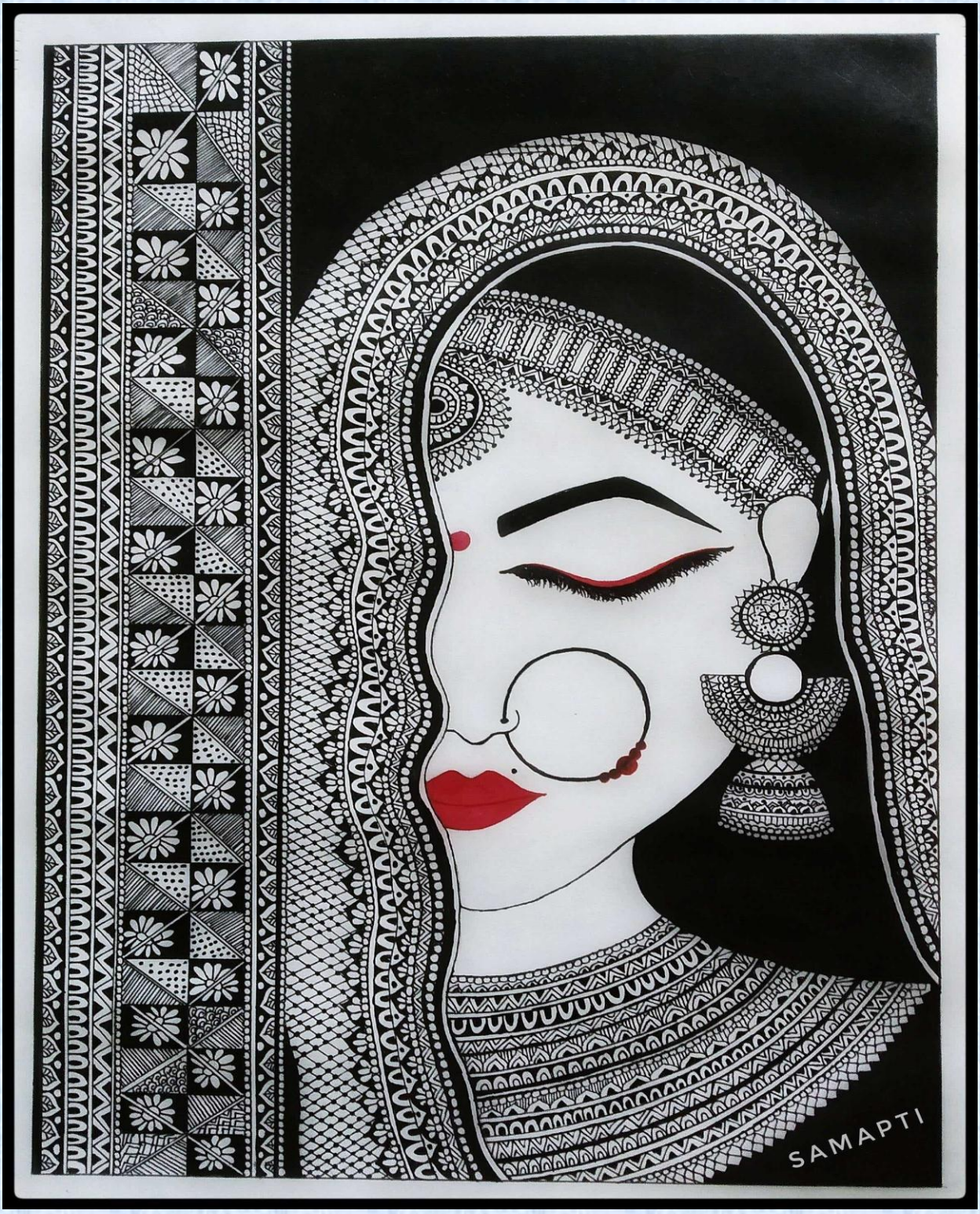

চিত্র: মধুবনী কনে

চিত্রাঙ্কণ: সমাপ্তি পাত্র
ষষ্ঠ সেমেস্টার, ইংরেজি বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

চিত্র: আজ জ্যোৎস্না রাতে

চিত্রাঙ্কণ: সৌরভ দাস
চতুর্থ সেমেস্টার, দর্শন বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

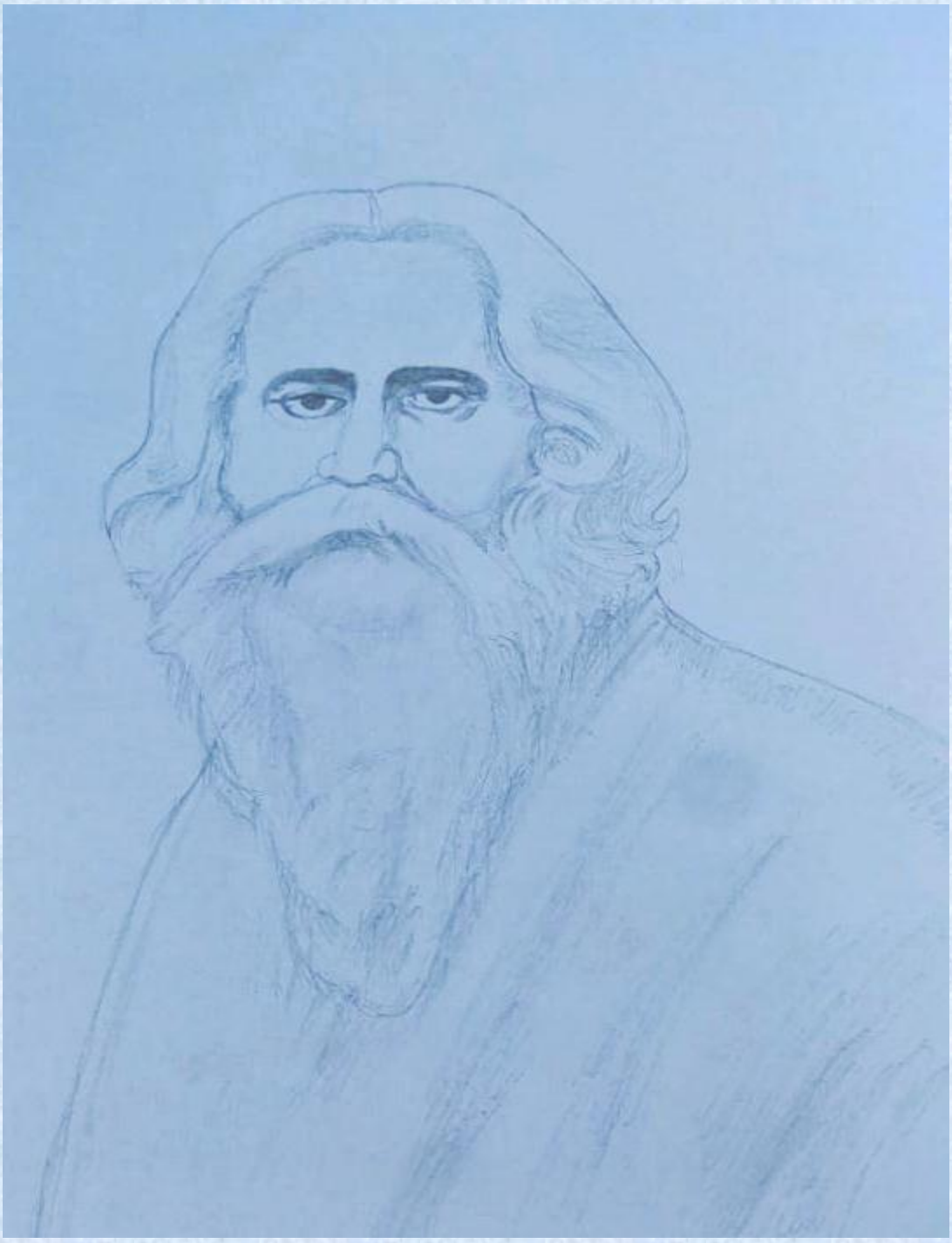

চিত্র: কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্রাঙ্কণ: অর্পণ কুমার দত্ত
দ্বিতীয় সেমেস্টার, দর্শন বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

চিত্র: মাধবীলতা

চিত্রাঙ্কণ: মুনমুন সেনা

দ্বিতীয় সেমেস্টার, ইংরেজি বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

জল ফুরোলে

মেলেছো ডানা

লেন্সে: সঞ্জয় প্রামানিক
প্রাক্তনী, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

ফুলে ফুলে

সোনা রোদ

লেন্সে: সঞ্জয় প্রামানিক
প্রাক্তনী, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

বাজ-ই মাত

নাম না জানা

লেন্সে: সঞ্জয় প্রামানিক
প্রাক্তনী, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

প্রজাপতি, কোথায় পেলে ভাই এমন রঙিন পাখা

লেন্সে: সঞ্জয় প্রামানিক
প্রাক্তনী, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

Flower Garden at Khirai

লেন্সে: শিল্পা করশর্মা
চতুর্থ সেমেস্টার, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, (স্নাতক, সান্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

Common tailorbird

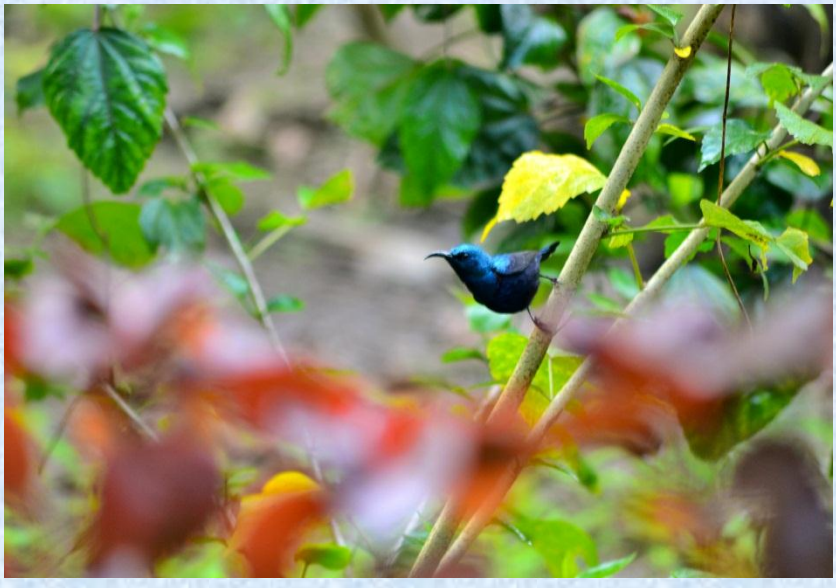

Palestine Sunbird

লেন্সে: শিল্পা করশর্মা
চতুর্থ সেমেস্টার, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, (স্নাতক, সান্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

মক্ষীরানি

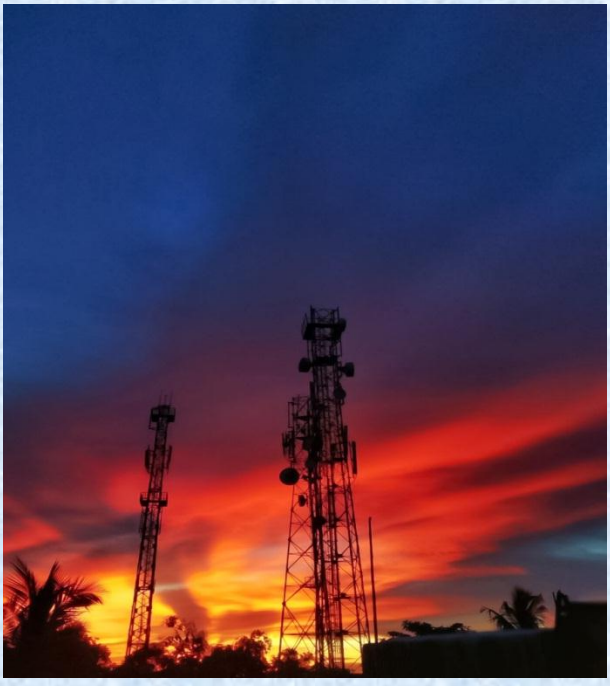

দিন ফুরোলে

লেন্সে: সমাপ্তি পাত্র
ষষ্ঠ সেমেস্টার, ইংরেজি বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

ফেরা, ২০২০-২০২১

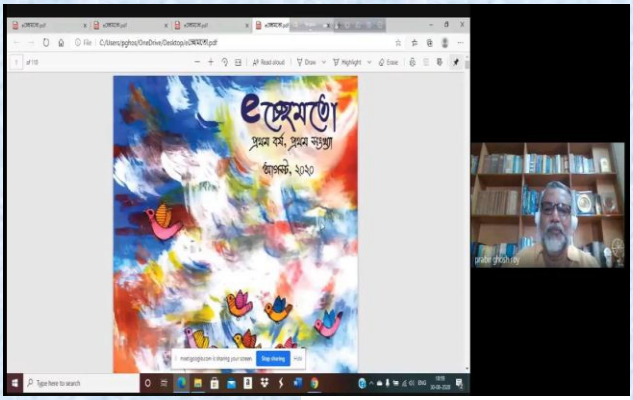

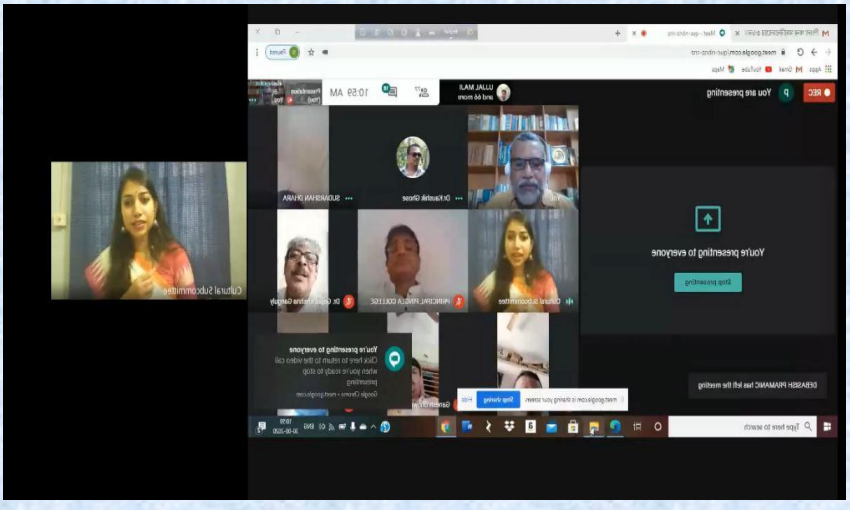

পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়ের ৫৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন এবং e-পত্রিকা eচ্ছেমতো, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যার উদ্বোধন

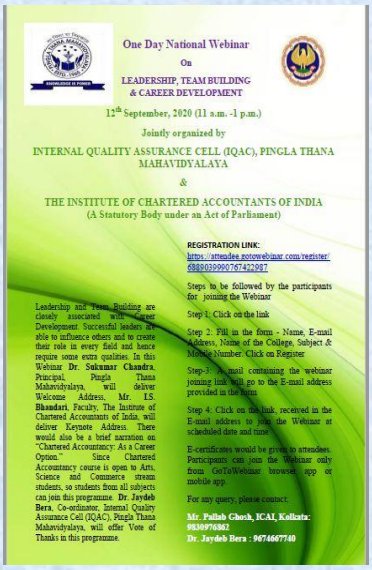

আই.কিউ.এ.সি দ্বারা আয়োজিত জাতীয় স্তরের আলোচনা চক্র (১২ই সেপ্টেম্বর, ২০২০) এবং একটি কর্মশালা (৪ই জুলাই, ২০২১)

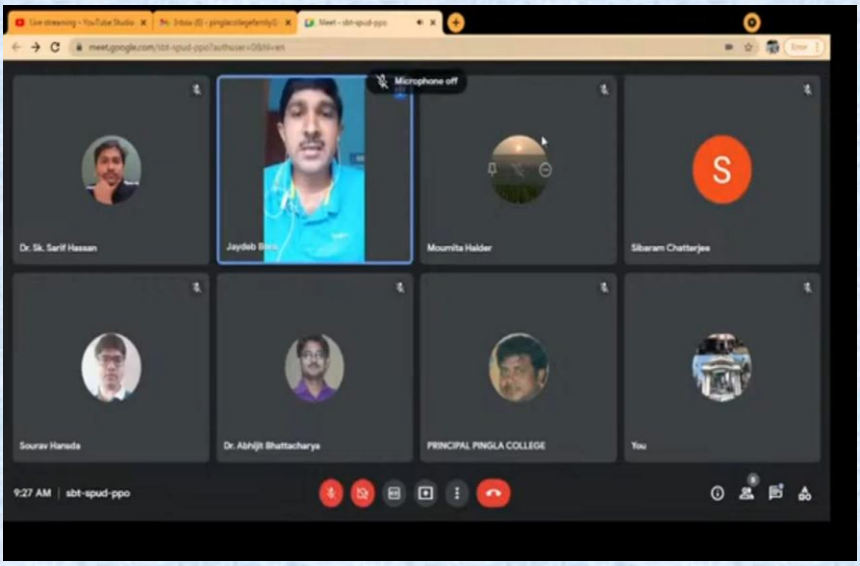

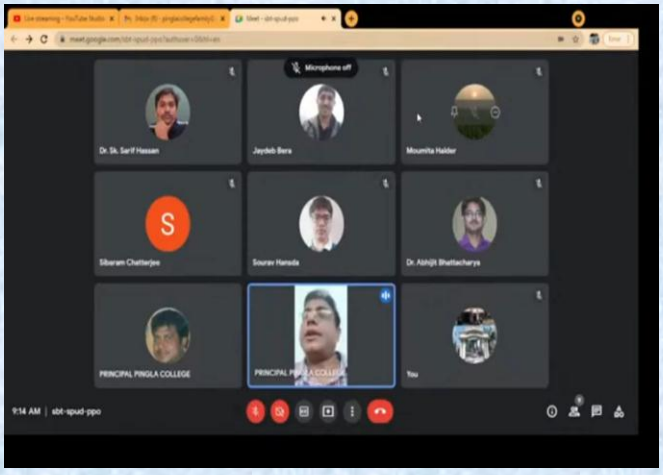

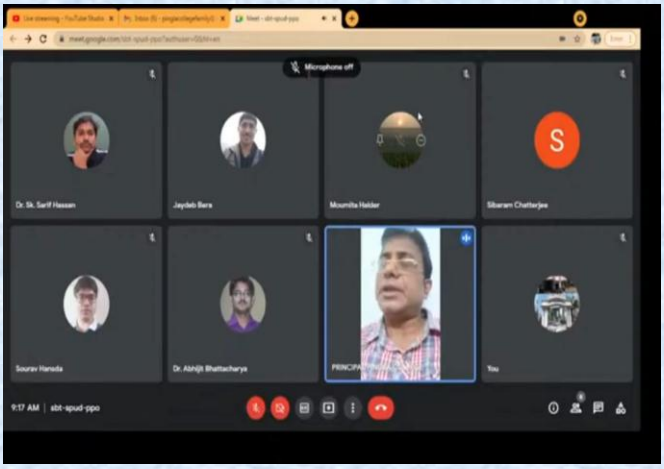

ইতিহাস বিভাগ দ্বারা আয়োজিত আন্তর্জাতিক স্তরের আলোচনা চক্র (১৯শে অক্টোবর, ২০২০)

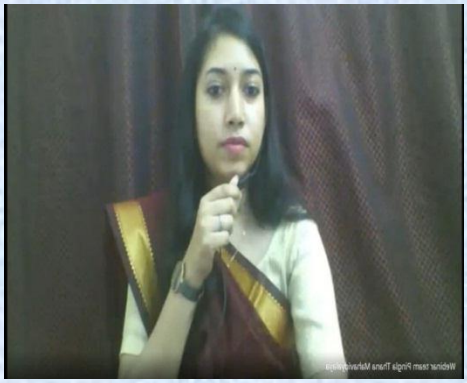

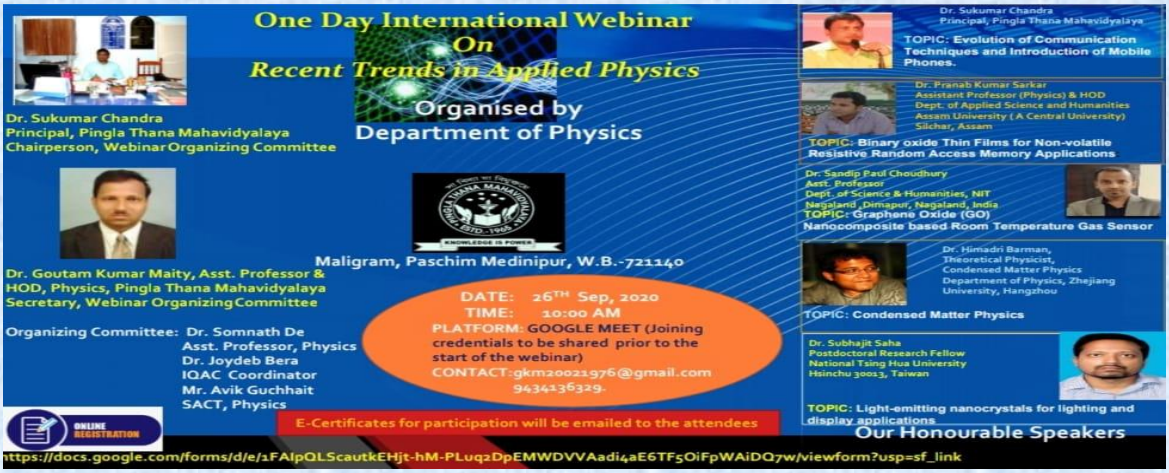

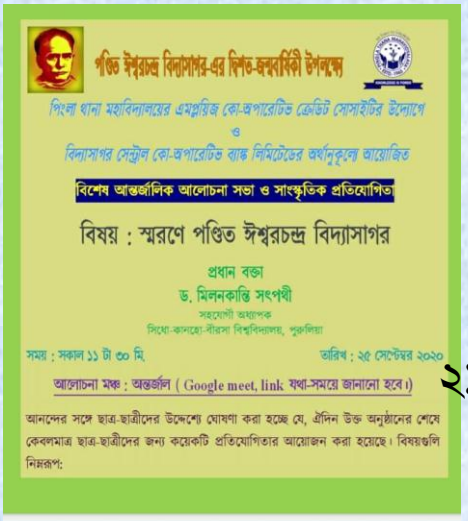

২১শে জুন, ২০২০

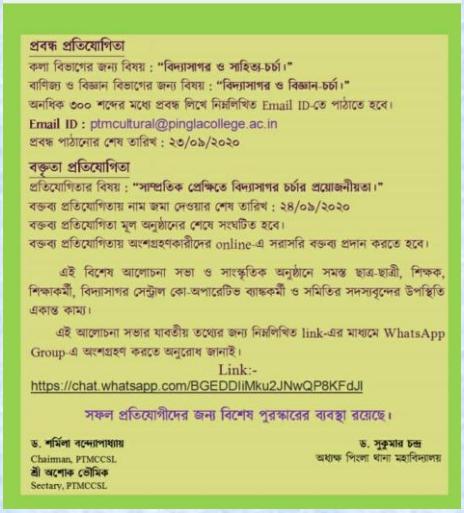

২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২০: পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়ের এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির উদ্যোগে এবং বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের অর্থানুকূল্যে আয়োজিত বিশেষ আন্তর্জালিক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২০: পদার্থ বিদ্যা বিভাগ দ্বারা আয়োজিত আন্তর্জাতিক স্তরের আলোচনা চক্র

৮ই জুন, ২০২১: Webinar on "Explore Career Opportunitiesin Govt. Sector and Unlock the Potentials in You jointly organised by RICE Education- Kharagpur and Pingla Thana Mahavidyalaya

১৬ই আগস্ট, ২০২১- ১৮ই আগস্ট, ২০২১: পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর উদ্যোগে আয়োজিত রাজ্য স্তরের কর্মশালা

স্বাধীনতা দিবস এবং সরস্বতী পুজো উদযাপন, ২০২১

PINGLA THANA MAHAVIDYALAYA

NSS UNITS (I, II, III & IV) ORGANISES
POSTER COMPETITION
TO CELEBRATE WORLD ENVIRONMENT DAY
5TH JUNE, 2021

Interested college students can participate in this competition

Theme: Contemporary Issues Related to Global Environment

Rules:

•Each participant can submit only one poster

•The poster must be made on the A4 size sheet with margins drawn with black pen or marker

•Acceptable tools for drawing/painting include pencil, crayon, watercolor, oil paint, etc. Photographs, print-outs won't be acceptable. It must be original and hand made.

•Name of the participant, Semester, Subject, college name must be clearly mentioned on the right-hand side bottom of the sheet.

TIME DURATION: 9:00AM – 05:00 PM (on 05.06.2021)

Judgment will be based on:
• Originality
• Relevance to the theme
• Artistic composition
• Creativity
• In accordance with the given instructions

SUBMISSION FORMAT: Participants have to submit the picture of the poster in PDF on the given email ID abhijitbhattacharya@pinglacollege.ac.in before or at 05:00 pm..

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন (৫ই জুন, ২০২১)

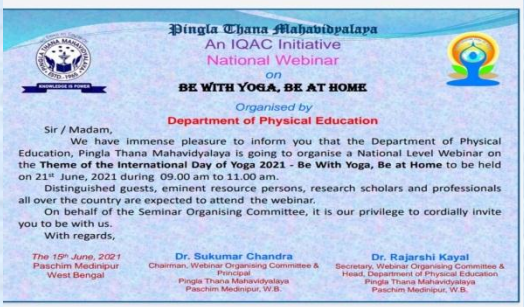

Pingla Thana Mahavidyalaya
An IQAC Initiative
National Webinar
on
BE WITH YOGA, BE AT HOME
Organised by
Department of Physical Education

Sir / Madam,

We have immense pleasure to inform you that the Department of Physical Education, Pingla Thana Mahavidyalaya is going to organise a National Level Webinar on the **Theme of the International Day of Yoga 2021 - Be With Yoga, Be at Home** to be held on 21st June, 2021 during 09.00 am to 11.00 am.

Distinguished guests, eminent resource persons, research scholars and professionals all over the country are expected to attend the webinar.

On behalf of the Seminar Organising Committee, it is our privilege to cordially invite you to be with us.

With regards,

The 15th June, 2021
Paschim Medinipur
West Bengal

Dr. Sukumar Chandra
Chairman, Webinar Organising Committee & Principal
Pingla Thana Mahavidyalaya
Paschim Medinipur, W.B.

Dr. Rajarshi Kayal
Secretary, Webinar Organising Committee & Head, Department of Physical Education
Pingla Thana Mahavidyalaya
Paschim Medinipur, W.B.

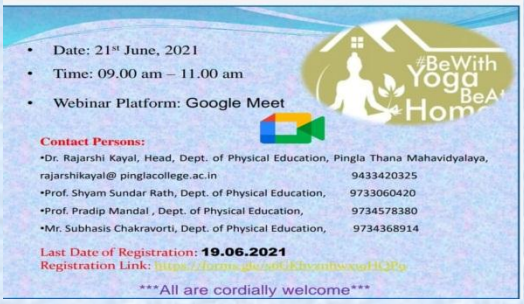

- Date: 21st June, 2021
- Time: 09.00 am – 11.00 am
- Webinar Platform: Google Meet

Contact Persons:
- Dr. Rajarshi Kayal, Head, Dept. of Physical Education, Pingla Thana Mahavidyalaya, rajarshikayal@ pinglacollege.ac.in 9433420325
- Prof. Shyam Sundar Rath, Dept. of Physical Education, 9733060420
- Prof. Pradip Mandal , Dept. of Physical Education, 9734578380
- Mr. Subhasis Chakravorti, Dept. of Physical Education, 9734368914

Last Date of Registration: **19.06.2021**
Registration Link: [illegible]

All are cordially welcome

PINGLA THANA MAHAVIDYALAYA

NSS UNITS (I, II, III & IV) ORGANISES
ONLINE YOGASANA EXHIBITION
TO CELEBRATE INTERNATIONAL YOGA DAY
21ST JUNE, 2021
Interested candidates can participate in this exhibition (No age Limit)

RULES:
- Each participant can submit only one video
- Background of the video must be clear
- Three yogasanas to be performed within 2 minutes (holding time – minimum 5 sec)
- Name of the participant, Semester, Subject, college and name of yogasanas must be mentioned in the video before starting yogasanas.

SUBMISSION DETAILS:

Participants can whatsapp his/her video at 9433717002 or can email at abhijitbhattacharya@pinglacollege.ac.in within 20th June 2021. An online yogasana presentation will be organised through google meet on 21st June 2021 at 11.30 AM. Along with their videos participants are also requested to mention his or her willingness to perform online on 21.06. 2021.

Google meet link for 21st June: https://meet.google.com/aoa-wcdo-enk Time: 11.30 AM

Selected videos will be posted on college facebook page

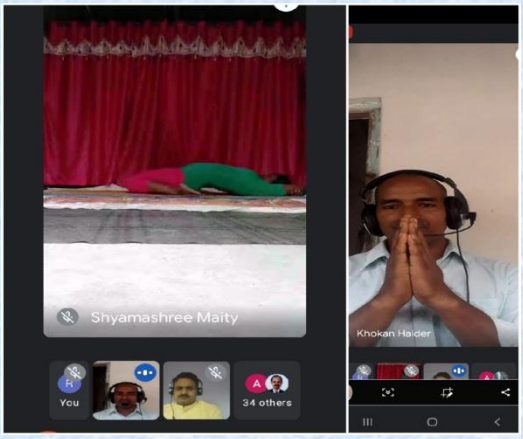

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে শারীরশিক্ষা বিভাগ দ্বারা আয়োজিত জাতীয় স্তরের ওয়েবিনার এবং NSS-এর উদ্যোগে আয়োজিত যোগ প্রদর্শনী (২১শে জুন, ২০২১)

পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

e-পত্রিকা

eচ্ছেমতো

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
আগস্ট, ২০২১

এই e-পত্রিকার সকল লেখা কপিরাইট সুরক্ষিত। এই e-পত্রিকার সকল লেখার বক্তব্য এবং মৌলিকত্বের দায় লেখকের। প্রকাশক বা সম্পাদক কোনো প্ল্যাগিয়ারিজমের জন্য দায়ী থাকবে না।